STOP
ATROCITIES
ON
MINORITIES

পরিষদ বার্তা

আগস্ট ২০১৬
নবপর্যায় ৪০
মূল্য ১০ টাকা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের ফিরিয়ে আনো মৃত্যুদন্ড নিশ্চিত কর
জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা নিপাত যাক
ংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দাবিতে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মানববন্ধন ছবি : পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সমাবেশ

বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দাবি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বিদেশে থাকা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে এনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। ৩১ আগস্ট বুধবার রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক মানববন্ধনে এ দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক নিম চন্দ্র ভৌমিক বলেন, এখন পুরোহিত, যাজক ও ভিক্ষুদের হত্যা করা হচ্ছে। এমনকি ঈদের জামাতেও হামলা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর ডাকে এখন প্রতিরোধ কমিটি হচ্ছে। সব ধর্মের মানুষের সমমর্যাদা রক্ষা করে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন, সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আইএস পরিচয়ে দেশের মানুষকে সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করছে। তবে প্রধানমন্ত্রী উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন। তিনি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও উস্কানিমূলক বক্তব্যের অভিযোগে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির নারায়ণহাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হারুনুর রশিদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তাপস কুমার পাল বলেন, একাত্তরে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী যাঁরা পালিয়ে আছেন, তাঁরাই জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষক। এঁরাই পুরোহিত-রাজাকারদের হত্যা করছেন। তাই বঙ্গবন্ধুর পালিয়ে থাকা খুনিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলেই জঙ্গিবাদ নির্মূল করা যাবে।

বক্তারা বলেন, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ধারা তৈরি হয়েছিল, জাতির জনককে হত্যার মধ্য দিয়ে সে ধারাকে হত্যা করার অপচেষ্টা চালানো হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সফল না হলেও ঐ ধারা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একাত্তরের পরাজিত শক্তি এই ষড়যন্ত্রকারীরা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়, মুক্তিযুদ্ধের অর্জনগুলো একে একে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে যারা বাংলাদেশে ক্ষমতা দখল করেছিল, তারা প্রথমেই ওই লক্ষ্যের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের অর্জন ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধানের ওপর আঘাত হানে। চার মূলনীতির অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষতাকে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বাদ নেয়া হয়, সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা পাল্টে দেয়া হয় এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সংকীর্ণ অর্থে সীমাবদ্ধ করা হয়। সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর থেকে বঙ্গবন্ধুর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়ে ধর্মান্ধতার বীজ বপণ করা হয়। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার বন্ধ করে তাদের সম্মানজনক পুনর্বাসন করা হয়।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নেতারা আরও বলেন, ক্ষমতা দখলকারীরা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধিতাকারী ও গণহত্যায় জড়িতদের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করেন, ক্ষমতায় অন্তর্ভুক্ত করেন। বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তানে পরিণত করতে ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার, গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকে নির্মূল করার পদক্ষেপ

পৃষ্ঠা ২

খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি জমিতে পর্যটন অঞ্চল গঠনের প্রস্তাব বাতিলের দাবি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

খাগড়াছড়ির আলুটিলায় ৬৯৯ দশমিক ৯৮ এক পাহাড়ি জমিতে বিশেষ পর্যটন অঞ্চল গঠনের প্রস্তাব বাতিলের দাবি জানিয়েছেন আলুটিলা ভূমি রক্ষা কমিটি, আলুটিলা ভূমি রক্ষা যুব কমিটি, নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদ এবং খাগড়াছড়ির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ৩১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো এক স্মারকলিপিতে এ দাবি জানানো হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে পাঠানো এই স্মারকলিপিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পের পরিবর্তে আলুটিলাসহ তার আশেপাশের জমির মালিকদের ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছের বাগান সৃজনের জন্য আর্থিক সহযোগিতা, প্রণোদনা ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়।

স্মারকলিপির পূর্ণ বিবরণ :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যম : জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

মহোদয়,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আমরা আলুটিলা এলাকার বাসিন্দাদের সদ্যগঠিত সংগঠন আলুটিলা ভূমি রক্ষা কমিটিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও নির্বাচিত সংগঠন, হেডম্যান এবং গণমান্য ব্যক্তিগণ আপনার সমীপে নিম্নোক্ত বক্তব্য নিবেদন করছি।

১। গত ১৫ জুন ২০১৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক বরাবরে লেখা এক পত্রে আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি-এর জন্য ৬৪০ একর খাস জমির অবস্থান, দাগসূচি ও মৌজা ম্যাপ প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান। উক্ত পত্রে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাংগা ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ২০৫ নং তৈকাতাং ও ২৬২ নং গোলাবাড়ী মৌজায় ৬৪০ একর জমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব পাওয়া যায় বলে উলেখ করা হয়। (পত্র নং : ০৩.৭৫৯.১৪.৫৩.০০.০৫৮.২০১৬-১০৫৩)।

২। অপরদিকে মাটিরাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের ১৩ জুলাই ২০১৬ তারিখের এক পত্রে (স্মারক নং-০৫.৪২.৪৬৭০.০১৩.০০.০০২.১৫-৩০৩)

পৃষ্ঠা ৩

প্রতিমা ভাংচুর ও মন্দিরে হামলা

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

জানান, খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টি তদন্ত করে দেখেছেন। আলামত সংগ্রহ করেছেন। তবে ওই এলাকার একটি স্কুলসহ নানা বিষয়ে নিয়ে দুটি পক্ষ দ্বিধা বিভক্ত রয়েছেন। ২৮ আগস্ট রাতে পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার মদনপুরা ইউনিয়নের পালপাড়া গ্রামের সার্বজনীন শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। আসন্ন দুর্গা পূজা উপলক্ষে তৈরি দুর্গাসহ সব প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়। এসময় দুর্বৃত্তরা পূজা না করার জন্য মন্দিরে একটি চিঠি ফেলে রেখে যায়।

পুলিশ ও মন্দির কমিটির সদস্যরা জানান, দুর্গা পূজা উপলক্ষে প্রতিমা তৈরি প্রায় শেষ পর্যায়ে। এসময় হঠাৎ করে মধ্যরাতে দুর্বৃত্তরা দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর করে। তারা প্রতিমার গায়ে গোবর ছিটিয়ে দেয় এবং হাতে লেখা দুই পৃষ্ঠার একটি চিঠি রেখে যায়। চিঠিতে পূজা না করাসহ বিভিন্ন আপত্তিকর কথা লেখা রয়েছে। পালপাড়া সার্বজনীন শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দিরের পূজা পরিচালনা কমিটির সভাপতি বরুন পাল জানান, ঘটনার দিন রাত ১২টা পর্যন্ত প্রতিমা গড়ার কারিগর (গুণরাজ) কাজ করে ঘুমাতে যান। সকালে প্রতিমা ভাঙা দেখে থানা পুলিশে খবর দেয়া হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বিষয়টি জানার পর হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহম্মদ আবদুলাহ আল মাহমুদ জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদেরকে সুষ্ঠুভাবে পূজা উৎসব উদযাপনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের নিরাপত্তা দেয়া হবে। তবে এঘটনায় জড়িত কাউকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দাবি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গ্রহণ করে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন, শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন ব্যবহার করে জায়গা-জমি দখল এবং দেশ থেকে বিতাড়ন তারই ফলশ্রুতি। পাকিস্তানের মতো ভিন্ন ধর্মীয় মানুষদের দেশ থেকে বিতাড়ন করে তাদের সংখ্যা হ্রাস করার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

পরিষদ নেতারা বলেন, আজ দেশে জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাস-ধর্মান্ধতা-সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী রাজনীতির ফসল। তবে সবচাইতে ইতিবাচক দিক হচ্ছে, আজ সারাদেশে এর বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ চেতনা তৈরি হচ্ছে, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের মানসিকতা গড়ে উঠেছে। এই মানসিকতার বিকাশ ঘটাতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধকে জীবনধারা ও সমাজচেতনায় ভিত্তি দিতে হবে। তবেই জঙ্গিবাদ-ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই সাফল্য পাবে। এর সঙ্গে সকল ধর্মের নাগরিকদের মধ্যে গভীর আস্থার সম্পর্কে গড়ে তুলতে হবে।

মানববন্ধন থেকে দুর্গাপূজার আগে দেশের মন্দিরগুলোতে নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি জানান হয়। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্মল চ্যাটার্জি, পরিষদের নেত্রী পদ্মাবতী দেবী, স্বপ্না বিশ্বাস। মানববন্ধনে ঐক্য পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির আলোচনা সভা

সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার নিশ্চিত করার দাবি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি আয়োজিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। বক্তারা বলেন, জাতির একটি অংশকে সমান অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে কোনভাবেই এ দেশ এগুতে পারবে না। ২০২১ সালের মধ্যে এ দেশ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে সবাইকে সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই।

২৭ আগস্ট শনিবার ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মেলাঙ্গনে মহনগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি ডি. এন. চ্যাটার্জী-র সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এমপি। উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাজী মো: সেলিম এমপি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান, ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ধ্রুবেশানন্দ মহারাজ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ এর সিএসসি বিশপ থিওটনিয়াস গোমেজ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি জয়ন্ত সেন দীপু ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তাপস কুমার পাল। বক্তব্য দেন অ্যাডভোকেট সত্যেন্দ্র চন্দ্র ভক্ত ও রমেন মন্ডল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শ্যামল কুমার রায় ও অনুষ্ঠানে পরিচালনা করেন জন্মাষ্টমী প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব অ্যাড. কিশোর রঞ্জন মন্ডল।

প্রধান অতিথি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এমপি তাঁর ভাষণে বলেন, মাথা নত করে, দুর্বল হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র। নিজেদের অধিকার নিজেদেরই আদায় করে নিতে হবে, যে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এ আয়োজন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এটাই শিক্ষা।

উদ্বোধনী ভাষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, এই দেশ সব ধর্মের মানুষের দেশ। কোন জঙ্গিবাদ এই দেশে স্থান পাবে না। সব ধর্মের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে জঙ্গিবাদ দমন করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণের পর শ্রীকৃষ্ণের লীলাভিত্তিক একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়।

সংসদে হিন্দুদের আসন সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিতে এরশাদ-কে ঐক্য পরিষদের অভিনন্দন

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গত ২৭ আগস্ট তারিখে আয়োজিত শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্যে ৩০টি আসন সংরক্ষণের বিষয় দলীয় নির্বাচনী ইসতেহারে থাকবে বলে সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ. এম. এরশাদ যে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন তাকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিত্রয় মেজর জেনারেল (অব:) সি. আর. দত্ত বীরউত্তম, ঊষাতন তালুকদার এম.পি. ও হিউবার্ট গোমেজ এবং সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে বলেছেন, এর মধ্য দিয়ে গত বছরের ৪ জানুয়ারি ঐতিহাসিক সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে ঐক্য পরিষদের মহাসমাবেশে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্যে সংসদে ৬০টি আসন সংরক্ষণের যে দাবি উত্থাপিত হয়েছিল তার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হয়েছে।

বিবৃতিতে এই মর্মে আশা প্রকাশ করা হয় যে, সংসদে সরকারি দল ও ১৪ দলীয় জোটের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশে অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র এবং ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার তাগিদে সংসদে আসন সংরক্ষণ, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয়, জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠনসহ ঐতিহাসিক সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে গৃহীত ঐক্য পরিষদের ৭ দফা দাবি বাস্তবায়নে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

কাটুক আঁধার

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

এসবের বিরুদ্ধে। নব প্রত্যয়ে আমাদের অঙ্গীকার ঋদ্ধ করার ব্যাপারে নবোদ্যম-উদ্যোগে যে সংগ্রাম চালানোর কথা ছিল এর বিরতি দিয়ে আমাদের লড়তে হচ্ছে পুনর্বার অশুভর বিরুদ্ধে। আমাদের চেতনাঋদ্ধ মননে এই অঙ্গীকার যথেষ্ট পুষ্ট যে, আমাদের স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেই কিন্তু এর আগে প্রশ্ন দাঁড়ায় কেনইবা অন্ধকারের অপচ্ছায়ার বিস্তার ঘটল! এর উত্তরও সচেতন মানুষ মাত্রই জানা। সেদিন একটা টেলিভিশন চ্যানেলের টকশো অনুষ্ঠানে প্রশ্নকর্তার এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম–একটি বিজয়ী জাতির নতুন করে লড়াই করতে হচ্ছে পুনঃবিজয়ের জন্য। এই যে বাস্তবতা তা অস্বীকারের তো কোনোই অবকাশ নেই।

তবুও আমরা আশাবাদী। আমরা আশাবাদী থাকতে চাই, আশাবাদিতার মধ্য দিয়েই, এগিয়েও যেতে চাই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে। কিন্তু এজন্য তো সর্বাংশে প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তির যথাযথ সহযোগিতা। আমাদের যে লড়াই তো প্রতিহিংসার নয়। এই লড়াই হলো ন্যায়বোধ প্রতিষ্ঠার। সাম্য প্রতিষ্ঠার। অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং আইনের শাসনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ করার। এ দেশের বৃহদাংশই বলে থাকেন–'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার।' হ্যাঁ, এই সত্যের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। এই সত্য একাত্তরে আরো পুষ্টরূপ লাভ করে বিপুল আত্মত্যাগ আর অসংখ্য মা-বোনের সম্ভ্রম বিসর্জনের মধ্য দিয়ে। এই সত্য এ দেশে অতীতে হীনস্বার্থবাদী শাসকদের হাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। ক্ষত সৃষ্টি করেছে। এর উপশমে আমাদের আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে এগোতে হবে। আমাদের ভরসা এই যে, কোনোভাবেই আমরা একা নই। এ দেশের অসংখ্য মানুষ যারা সংখ্যাগুরু শ্রেণীভুক্ত তারা আমাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে এক কাতারে দাঁড়াতে দ্বিধা করেননি। এ জন্য তাদেরকে নিশ্চয়ই অভিনন্দন। কল্যাণের পথ প্রশস্ত হোক সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। ন্যায় নিশ্চিত হোক সচেতন-প্রগতিবাদী সবার দৃঢ়তায়। সত্য ও ন্যায় কখনো কখনো বাধাগ্রস্ত হয়, আঘাতপ্রাপ্ত হয় কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে চূড়ান্তপর্বে জয় এসবেরই হয়। এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। আমরা সমস্বরে এ কথা বহুবার দৃঢ়ভাবে ইতোমধ্যে উচ্চারণ করেছি–সত্য ও ন্যায় জয়যুক্ত হয়েছে, জয়যুক্ত হয়েছে। কাজেই শত বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা-প্রতিকূলতার মাঝেও এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্নটাই আমাদের আরো বেশি স্বপ্নবান করে। শুভবোধসম্পন্ন মানুষের মনোজগতে সত্য-সুন্দর-ন্যায়ের চেতনার দখলদারিত্বই তো হলো আমাদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণের প্রশস্ত সড়ক। এই সড়ক ধরেই এগোতে হবে। এই প্রত্যয়েই ক্রম হতে হবে দৃঢ়। বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাসে অসাম্প্রদায়িক চেতনা অনেক কিছুর মধ্যে অন্যতম। কাজেই এই চেতনার বিলুপ্তি ঘটা সম্ভব নয়, কখনোই নয়। কখনো কখনো এর ওপর হিংস্রতার ছোবল পড়েছে এবং পড়ছে বটে। কিন্তু এর যে কঠোর প্রতিবিধান হয়েছে বা হচ্ছে এমন দৃষ্টান্তও আমাদের সামনেই আছে। জয় হোক মানবতার। জয় হোক সত্যের। জয় হোক ন্যায় পরায়ণতার। জয় হোক শুভ সব চেতনার। আমরা সেই পথের সৈনিক যে পথ কখনোই অকল্যাণের দিকনির্দেশক নয়। দিকনির্দেশক হলো কল্যাণের। শারদীয় উৎসবের প্রায় ঊষালগ্নে আমরা আবার ঋদ্ধ হতে চাই নব অঙ্গীকার-প্রত্যয়-স্বপ্নে।

লেখক: সিনিয়র সহকারী সম্পাদক, মানবকণ্ঠ

১৬৬ একর সম্পত্তি বেহাত হওয়ার পথে

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

যা ছিল এক প্রকার পরিখা বেষ্ঠিত। মূল রাজবাড়ী (রাজভবন) ১৬ একর জমির উপর নির্মিত হয়েছিল। একদা সেখানে ছিল স্ফটিক মন্ডিত দরবারগৃহ, জলসাঘর, তোষাখানা, পাঠাগার, টেনিস গ্রাউন্ডের পাশাপাশি আয়না মহল, রানীমহল, ঠাকুরবাড়ী মহল, ফুলের বাগান ফুলবাগ, হীরাবাগ ইত্যাদি। অতিথি ভবন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক এলাকা ছিল রাজবাড়ীর মূল এলাকায়। রাজবাড়ীর ভেতরে ব্যবহারের জন্য ছিল ৩টি সংরক্ষিত পুকুর। মাছ চাষ এবং প্রজাদের ব্যবহারের জন্য রাজ পরিবার খনন করে পদ্ম দীঘি, হরি সাগর, মাতা সাগর, সুখ সাগর, আনন্দ সাগর ও প্রাণ সাগর। দিনাজপুর রাজ পরিবারের অমর কীর্তি ঐতিহাসিক রামসাগর। যা শহর থেকে ৮ কি: মি: দক্ষিণে আউলিয়াপুর গ্রামের অংশে যার আয়তন ৪ দশমিক ৩৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা। রাজা প্রাণনাথ-রামনাথের আমলের আরেক কীর্তি পোড়ামাটির ফলক খচিত কান্তজীউ মন্দির।

সরকারি সূত্র মতে, দিনাজপুর রাজবাড়ী সব মিলিয়ে ১৬৬ একর জমির উপর অবস্থিত। রাজবাড়ীর মূল মহলগুলো বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আছে শুধু ধ্বংসাবশেষ। রাজবাড়ীর অধিকাংশ অংশে বিরাজ করছে ভীতিময় পরিবেশ। যা হানাবাড়ীর সাথেই তুলনা করা যায়।

এদিকে এ ব্যাপারে দিনাজপুর জেলা প্রশাসক মীর খায়রুল আলমের সাথে কথা বললে তিনি পরিষদ বার্তাকে বলেন, রাজবাড়ী রক্ষার জন্য অচিরেই একটি প্রস্তাবনা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে।

এ ব্যাপারে দিনাজপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক গোলাম নবী দুলাল বলেন, দিনাজপুরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী মহারাজার রাজবাড়ীকে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে রক্ষা করতে হবে। অন্যদিকে সরকারী কলেজের দর্শন বিভাগের সহকারী শিক্ষক ড. মাসুদুল হক বলেন, দিনাজপুর রাজবাড়ীকে অচিরেই হেরিটেজের আওতাভুক্ত করা হোক।

জেলাবাসীর দাবী জবর দখলদারীর হাত হতে পুনঃরুদ্ধারের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ ও সংরক্ষণে ব্যবস্থা নেয়া হোক।

উলেখ্য, দিনাজপুর রাজ ভারতের মালদাহ, প্রতিরাম, কুষমন্দি, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, নওগাঁ ও ঠাকুরগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

রাজ বংশের গোড়াপত্তন : দিনাজপুর রাজ বংশের গোড়াপত্তন হয়েছিল সম্রাট আকবরের সময়কাল থেকে। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৫টি সুবায় বিভক্ত করেন এবং বঙ্গদেশের সুবেদার নিয়োগ দেন শেলিকে। পরে আবার সুবা বাংলাকে ২৪টি সরকারে বিভক্ত করে। এর মধ্যে ৬টি সুবার কিছু অংশ দিনাজপুর জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। দিনাজপুর মালদ্হ জনৈক জমিদারের অংশে ছিল। এই জমিদার রাজা গণেশের বংশধর ছিলেন। ঐতিহাসিক বুকানন তাকে কাশি নামে অভিহিত করেন। দিনাজপুরে ১২ রাজা ৪০০ বছরে ধরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা গণেশের বংশই মহারাজার উত্তরসুরীরা ছিলেন। এরা হলেন রাজা শুভদেব রায়, রামদেব রায়, রাজা জয়দেব রায়, প্রাণ নাথ রায়, রামনাথ রায় (মহারাজ), কৃষ্ণ নাথ রায়, বৈদ্য নাথ রায়, মহারাজা রাধানাথ রায়, মহারাজা গোবিন্দ নাথ রায়, তারক নাথ রায়, মহারাজা গিরিজানাথ রায় ও সর্বশেষ মহারাজা জগদীশ নাথ রায়।

খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি জমিতে পর্যটন অঞ্চল গঠনের প্রস্তাব বাতিলের দাবি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উক্ত পর্যটন জোনের প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ ৬৯৯.৯৮ একর উলেখ করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবিত জমির মধ্যে ৬০৪ একর মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন ২০৪ নং আলুটিলা মৌজা ও ২০৫ নং তৈকাতাং মৌজার এবং ৯৫.৯৮ একর খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ২৬২ নং গোলাবাড়ী মৌজার অন্তর্ভুক্ত।

৩। উক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে গোলাবাড়ী মৌজায় অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবিত জমি বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে এবং সার্ভেয়ার কর্তৃক খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) -এর কাছে প্রেরিত তদন্ত প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত ৯৫.৯৮ একর জমির মধ্যে (৯৫.৯৮-৮ একর মংসাইগ্য চৌধুরীর জমি) ৮৭ একর খাস বা সরকারের মালিকানাধীন দেখানো হয়েছে। মাটিরাঙ্গা উপজেলায় অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবিত জমির উপর তদন্ত প্রতিবেদনে কী উলেখ করা হয়েছে তা জানা যায়নি। তবে মাটিরাঙ্গা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের একটি নথিতে আলুটিলা মৌজার ৬৩৬ নং দাগের ও তৈকাতাং মৌজার ৩ নং দাগের সমস্ত জমিসহ প্রস্তাবিত ৬০৪ একর খাস বলে উলেখ করা হয়েছে।

৪। আমরা মনে করি খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় সার্ভেয়ারের তদন্ত প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত জমি বিষয়ে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ চিত্র ফুটে ওঠেনি। সংশিষ্ট মৌজা হেডম্যানের বক্তব্য গ্রহণ না করা এবং প্রত্যক্ষ ও সরেজমিন তদন্তের দুর্বলতা ও ঘাটতিই এর প্রধান কারণ। অন্যদিকে মাটিরাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নথিতেও প্রস্তাবিত জমি বিষয়ে সঠিক তথ্য দেয়া হয়নি। সরেজমিন তদন্ত না করে উক্ত দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে বলে আমাদের ধারণা।

৫। প্রকৃতপক্ষে গোলাবাড়ী মৌজায় অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবিত জমিতে একটি গ্রামের ৮ পরিবারের ৪০ জন পাহাড়ির বসবাস রয়েছে। এছাড়া এখানে 'আলোক নবগ্রহ ধাতু চৈত্য বিহার' নামে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একটি উপাসনালয়, খৃষ্টানদের ১টি গীর্জা ও ১টি শ্মশানেরও অবস্থিতি আছে।

৬। মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন তৈকাতাং মৌজায় প্রস্তাবিত জমিতে বর্তমানে ১২টি গ্রামে ৩৯৭টি পরিবারের মোট ১,৬৪২ জন পাহাড়ি বসবাস করছেন। এছাড়া এই গ্রামগুলোতে রয়েছে ৫টি হিন্দু মন্দির, ৩টি শ্মশান, ব্র্যাক পরিচালিত স্কুল ১টি, ইউনিসেফ পরিচালিত স্কুল ৪টি ও জাবারাং (এনজিও) পরিচালিত স্কুল ১টি।

৭। মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন আলুটিলা মৌজায় প্রস্তাবিত জমিতে ৮টি গ্রাম অন্তর্ভুক্ত। এসব গ্রামে বাস করছেন ১১৩টি পরিবারের ৪৭১ জন সদস্য। এখানে ২টি হিন্দু মন্দির, ১টি গীর্জা, ১টি কমিউনিটি সেন্টার, ১টি সরকারি স্কুলসহ ৬টি প্রাইমারী স্কুল (হৃদয় মেম্বার পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুনর্বাসন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ব্র্যাক স্কুল ২টি, ইউনিসেফ স্কুল ২) ও ৩টি শ্মশান রয়েছে।

৮। এছাড়া উক্ত তিন মৌজায় প্রস্তাবিত জমিতে ৩৮ ব্যাক্তি ও সমিতির নামে শত শত একরের বিভিন্ন ফলজ ও বনজ বাগান এবং ঔষধী গাছ রয়েছে। এইসব বাগান থেকে তারা বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে তাদের পরিবারে ও সমাজে সমৃদ্ধি আনয়ন করছেন। পাহাড়ি বাঙালি মিশ্রিত জমির মালিকদের মধ্যে রয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সংসদ সদস্য যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, তার স্ত্রী ক্রাইচাউ মারমা, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জাহেদুল আলম, কলেজের শিক্ষক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তাসহ অনেকে।

৯। আমরা অবশ্যই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সরকারের বলিষ্ঠ অঙ্গীকারকে স্বাগত জানাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জীবন মান উন্নয়নের ব্যাপারেও যে সরকারের দৃষ্টি রয়েছে তা উপরোক্ত পর্যটন জোন গঠনের প্রস্তাব থেকে বোঝা যায়। আমরা অবশ্যই চাই খাগড়াছড়িসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর পার্বত্য অঞ্চলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হোক। কিন্তু তা সত্বেও নিম্নোক্ত বিশেষ কারণে আমরা প্রস্তাবিত এলাকায় বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি গঠনের প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয় বলে মনে করি :

ক) প্রস্তাবিত জমিতে আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন গঠন করা হলে দু'টি উপজেলার তিনটি মৌজায় ২১টি গ্রামের ৫১৮টি পরিবারের ২,১৫৩ জন পাহাড়ি নিজ জমি ও বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদের শিকার হবেন। প্রধানত ত্রিপুরা জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত এই বসতিগুলো শত বছরের পুরোনো এবং তারা জীবিকার জন্য মূলতঃ জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিকভাবে এত বিশাল এলাকা অধিগ্রহণ করা হলে তাদের পক্ষে জুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করা কোন মতে সম্ভব হবে না।

খ) শত শত বছর ধরে উক্ত এলাকায় বসবাস করলেও এই এলাকার রীতি ও প্রথা অনুযায়ী স্ব স্ব দখলীয় জায়গা বন্দোবস্তী নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের (potential victims) জমির মলিকানা সংক্রান্ত কোন দলিলপত্র নেই। সে কারণে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য উক্ত জমি অধিগ্রহণ করা হলে তারা ন্যায্য ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হবেন।

হবেন উন্নয়নের বলি। অতীতেও উন্নয়নের নামে এভাবে বহুবার পাহাড়িদেরকে নিজ বাপদাদার ভিটেমাটি ও জমিজমা থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিবর্তে তাদের জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার ও দারিদ্র্য।

ঘ) যদি ধরে নেয়া হয় যে তাদেরকে উচ্ছেদ না করতে তাদের বসতিগুলো বাদ দিয়ে বাকি জমি অধিগ্রহণ করা হবে, তাহলেও চূড়ান্ত ফলাফল হবে একই। কারণ একটি পাহাড়ি গ্রামকে টিকে থাকার জন্য যে বনাঞ্চলের প্রয়োজন হয় সে বনকে খাস হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং সে বন দখল করা হলে তাদেরকে বেঁচে থাকার 'লাইফ লাইন' থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। ফলে তাদেরকে 'লাইফ বাডের' অভাবে শুকিয়ে মরে যেতে হবে।

ঙ) সার্ভেয়ারের প্রতিবেদনে যে জমিগুলো খাস দেখানো হয়েছে সেগুলো প্রকৃতপক্ষে খাস নয়। সে সব জমিতে শত শত বছর ধরে লোকজন বসবাস ও জুমচাষ করে আসছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ ভূমি ব্যবস্থাপনার কারণে উক্ত জমি ভোগ দখল করার জন্য তাদের জমির মালিকানার প্রয়োজন হয়নি। যারা একটি নির্দিষ্ট জমিতে বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসছেন, তাদের মালিকানার দলিল না থাকার অজুহাতে ওই জমিকে হঠাৎ 'খাস' হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হলে তা হবে সকল ধরনের মানবিকতা, ন্যায়বিচার ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। এমনকি তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ আইনেরও লজ্ঘন হবে।

চ) যারা প্রস্তাবিত জমিতে বহু কষ্টে সঞ্চিত ব্যক্তিগত পুঁজি খাটিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছেন এবং এভাবে নিজের পরিবারের, সমাজের ও দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়ে আসছেন, তারাও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আলুটিয়ায় এত বছর ধরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে নীরবে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে, সেখানে প্রস্তাবিত পর্যটন জোন গঠন করা হলে তা শেষ হয়ে যাবে। আর এটাই হবে 'আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি নামে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার' সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।

ছ) আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন গঠনের প্রস্তাব দেয়ার আগে স্থানীয় আলুটিলাবাসী, সংশিষ্ট মৌজা হেডম্যান, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিসহ কারোর মতামত গ্রহণ করা হয়নি। তাই আমরা মনে করি উক্ত প্রস্তাব ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল মাত্র এবং তা অর্থনৈতিকভাবেও লাভজনক হবে না।

জ) খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ আইনের ৬৪(ক) অনুচ্ছেদে সরকারি খাস জমি পরিষদের সম্মতি ছাড়া বন্দোবস্ত বা অন্য কোন উপায়ে হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একই আইনের ৬৪(খ) অনুচ্ছেদে বলা আছে: পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সহিত আলোচনা ও উহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।' অথচ সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই আইন অমান্য করে প্রস্তাবিত জমিতে পর্যটন জোন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা পার্বত্য জনগণের মধ্যে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করবে।

ঝ) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৬টি হিন্দু মন্দির, ২টি খ্রিস্টান গীর্জা ও ১টি বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস, পরিত্যক্ত বা ব্যবহার-অনুপযোগী হয়ে পড়বে এবং এলাকার জনগণ তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। পর্যটনের নামে অবকাঠামো নির্মাণ ও ব্যাপক সংখ্যক লোকের আনাগোনার ফলে এলাকায় প্রাকৃতিক পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এক কথায়, অর্থনৈতিক ক্ষতি ছাড়াও প্রস্তাবিত আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন প্রকল্পটির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত ক্ষতি হবে মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী।

ঞ) আলুটিলায় পর্যটন কার্যক্রমের ফলে যে অর্থনৈতিক লাভ হবে তার সুফলও পাহাড়িদের ঘরে উঠবে না। বান্দরবান, রাঙামাটি ও সাজেকের পর্যটনের চিত্র তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ট) সার্বিক বিচারে উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে এবং কোন ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল খুশীর ভিত্তিতে আলুটিলায় বিশেষ পর্যটন জোন গঠন করা হলে তা হবে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতি চরম অন্যায় ও অমানবিক।

১০। আমরা কোনভাবেই উন্নয়নের বিরোধী নই। পৃথিবীতে সবাই সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি চায়। কিন্তু আমরা এমন উন্নয়ন, এমন পর্যটন চাই না, যার ফলে কোন একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে তার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়, নিজ জমি-বন থেকে উৎখাত হতে হয়, তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায় এবং তাদেরকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর জীবন কাটাতে হয়।

তাই আমরা মনে করি উপরোক্ত বিশেষ কারণে 'আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি নামে অর্থনৈতিক অঞ্চল' গঠনের প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য হতে পারে না। এমতাবস্থায় আমরা আপনার কাছে নিম্নোক্ত দাবি জানাচ্ছি :

ক) স্থানীয় জনগণের মতামত না নিয়ে ব্যক্তি বিশেষের উত্থাপিত 'আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি নামে অর্থনৈতিক অঞ্চল' গঠনের প্রস্তাব বাতিল করতে হবে।

খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পের পরিবর্তে বরং আলুটিলাসহ তার আশেপাশের জমির মালিকদের ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছের বাগান সৃজনের জন্য আর্থিক সহযোগিতা, প্রণোদনা ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হোক।

ধন্যবাদসহ বিনীত নিবেদক তারিখ: ৩১/০৮/২০১৬ খ্রি:

আলুটিলা ভূমি রক্ষা কমিটি, আলুটিলা ভূমি রক্ষা যুব কমিটি, নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদ, খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন সংগঠন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গবৃন্দ।

স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে আছেন– চঞ্চুমনি চাকমা, জ্ঞান রঞ্জন তিহরা, অনন্ত বিহারী খীসা, সুধীন চাকমা, রঞ্জোৎপল ত্রিপুরা, বীর বিক্রম ত্রিপুরা, উস্যাইন, নিবুল লাল, রিনক ত্রিপুরা, তপন বিকাশ ত্রিপুরা, রামানন্দ রোয়াজা, ক্ষেত্রমোহন বোয়াজা, বিনোদ বিহারী চাকমা, মধুমঙ্গল চাকমা, নমিতা চাকমা, মনজয় ত্রিপুরা, বিউটি রানী ত্রিপুরা, পুরষোত্তম চাকমা, অমৃত লাল ত্রিপুরা, অজয় জ্যোতি ভিক্ষু, দীপায়ন চাকমা, হরিধন ত্রিপুরা, চিরণজিৎ ধামাই, রেশম কান্তি ত্রিপুরা, সনিজৎ ত্রিপুরা, কিতুক মোহন ত্রিপুরা, হরণ জয় ত্রিপুরা, কিস্ত কুমার ত্রিপুরা, কমি বিকাশ ত্রিপুরা, অলেন বিকাশ ত্রিপুরা, রাজেন্দ্র ত্রিপুরা, দেবময়, জয়ন্ত বিকাশ ত্রিপুরা, তপন বিকাশ ত্রিপুরা, শান্তি বরণ চাকমা, শুভংকর চাকমা, রবীন বিকাশ চাকমা, চুবেন্দ্রলাল ত্রিপুরা, সুকৃতি জীবন চাকমা, কান্তি লাল দেওয়ান, শক্তি নন্দ চাকমা, মিল্টন চাকমা, অনুপম চাকমা, তৃপ্তিময় চাকমা, সাজাই মনি, ঈশ্বরচন্দ্র চাকমা, পরিমল ত্রিপুরা, অজিত বরণ চাকমা, বীর বিক্রম ত্রিপুরা, অরুণ কারবারী, তস্রাই মগ, আজশি মারজা, নিপুলকান্তি চাকমা, কনক দেওয়ান, রিপন চাকমা, প্রশান্ত ত্রিপুরা, জয়পাল চাকমা, শান্তিময় ত্রিপুরা, ধীমান খীসা, প্রতীক ত্রিপুরা, রামানন্দ ত্রিপুরা, জীবলাল চাকমা, আশিক বাবু, সোহাগ চাকমা, সরেন চাকমা, জ্ঞানবিদ্যা চাকমা, শিমূল চাকমা, জ্যোতিশ্বর চাকমা, বিজয় বিকাশ চাকমা, স্বদেশ প্রীতি চাকমা, প্রিয় কান্তি চাকমা, শক্তিমান চাকমা, শুভধন চাকমা, রূপায়ন চাকমা, দীপায়ন চাকমা, গিরাসন ত্রিপুরা, পীযুষ কান্তি ত্রিপুরা কোকোনাথ, কিরণ ত্রিপুরা, প্রশান্তি ত্রিপুরা, সুমঙ্গল চাকমা, খগেন্দ্র ত্রিপুরা, ঊষা মারমা, রবি শঙ্কর তালুকদার ও ফাদার রাজেন্দ্র ত্রিপুরা।

পরিষদ বার্তার ই-মেইল সংবাদ পাঠানো প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র ই-মেইল ঠিকানা parishadbarta@gmail.com-এ সব খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মতামত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্র ও ছবি এই মেইলে পাঠানোর জন্য পরিষদের সকল জেলা উপজেলা শাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ই-মেইলে ঐক্য পরিষদ, অঙ্গসংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের খবর ছাড়াও এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর খবরও পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিনই কয়েক'শ বার্তা এই ই-মেইলে জমা হয়, যেখান থেকে সংশিষ্ট খবর বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা' ২০১৩ সালের মে মাস থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তার কপি বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বিকাশ' একাউন্ট নম্বর- ০১৭৩৩-২৯২৩৯৬ যোগে যথাসময়ে পাঠানোর জন্যে জেলা সংগঠনসমূহের সংশিষ্ট সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

এতদ্ব্যতীত পরিষদ বার্তার কপি নিয়মিত পাওয়ার ব্যাপারে ঐক্য পরিষদের দপ্তর সম্পাদক এ্যাডভোকেট দিপংকর ঘোষের সাথে ০১৭১২-৭৬০৬৮৪ মোবাইল নম্বরে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কেউ কেউ পত্রিকার কপি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছেন। আমরা এই অনুরোধ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

জেলা কমিটির প্রতি অনুরোধ

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা কমিটিসমূহকে জেলায় কোনও সাম্প্রদায়িক নির্যাতন নিপীড়ন ও হামলার ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিষদ বার্তার সম্পাদকীয় কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে ছবি ও স্থানীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি ও গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য সংযুক্ত করে পাঠালে তা পরিষদ বার্তায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

বি চি ন্তা

মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ গেরিলা বাহিনীর ভূমিকা

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

(গত সংখ্যার পর)

পটভূমি

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে শত বছরব্যাপী অগ্নিযুগের সশস্ত্র বিপ্লব, অহিংস অসহযোগ ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ও অধিকারের ত্রিধারার আন্দোলনের পাশাপাশি বঞ্চিত আদিবাসী জাতিসমূহ এবং কৃষক শ্রমিকের তেভাগা-টংক-নানকার প্রভৃতি আন্দোলন-ফকির বিদ্রোহ, সন্ন্যাস বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ তথা ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধের বলিষ্ঠ ধারার মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম। এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মুখে বৃটিশরাজ যখন দিশেহারা তখনই তারা প্রয়োগ করে 'ভাগ কর ও শাসন কর' সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি। সকল সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ব্যবহার করে বৃটিশরাজ সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির হাতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষকে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করে। সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িক কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তান। সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির কারণে পূর্ববঙ্গ ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শোষণের সাথে পাঞ্জাবি একচেটিয়া ধনিকদের শোষণেরও শিকার হয়। এই অর্থনৈতিক শোষণকে নিরঙ্কুশ করার জন্য পাক শাসকচক্র বাঙালি ভাষা-সংস্কৃতি- ঐতিহ্য-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে আঘাত, জাতিগত শোষণ- নিপীড়নের এক হিংস্র অধ্যায়ের সূচনা করে।

বিংশ শতাব্দীতে অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা যাঁদের অধিকাংশই ত্রিশের দশকে কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও ধর্মের নামে ভারত বিভক্তি ঠেকাতে পারেননি। পাকিস্তান আমলের ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা। এক শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশে জেল- জুলুম, হুলিয়া, হামলা- মামলা, হত্যা উপেক্ষা করে কমিউনিস্টসহ বামপন্থীরা শুরু করে গণতন্ত্র, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও অন্নবস্ত্রের সংগ্রাম। 'রাণীমা' ইলা মিত্রের নাচোল বিদ্রোহ, ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন, কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বে টংক আন্দোলন, অজয় ভট্টাচার্য- বারীণ দত্তের নেতৃত্বে সিলেটের নানকার আন্দোলন ছিল এই সময়কার দেশ ও দুনিয়া কাঁপানো ঘটনা। পাকিস্তান আমলে ১৯৫০ সনে প্রথম জেলহত্যায় রাজশাহীর খাপড়া ওয়ার্ডে শহীদ হন হানিফ, বিজন, দেলোয়ার, কম্পরাম সিংহ, সুখেন, সুধীর ও আনোয়ার। ঢাকা জেলে অনশন সংগ্রামে শহীদ হন শিবেন রায়। এঁরা সকলেই ছিলেন কমিউনিস্ট ও বামপন্থী।

> বিংশ শতাব্দীতে অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা যাঁদের অধিকাংশই ত্রিশের দশকে কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও ধর্মের নামে ভারত বিভক্তি ঠেকাতে পারেননি। পাকিস্তান আমলের ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা। এক শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশে জেল- জুলুম, হুলিয়া, হামলা-মামলা, হত্যা উপেক্ষা করে কমিউনিষ্টসহ বামপন্থীরা শুরু করে গণতন্ত্র, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও অন্নবস্ত্রের সংগ্রাম। 'রাণীমা' ইলা মিত্রের নাচোল বিদ্রোহ, ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন, কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বে টংক আন্দোলন, অজয় ভট্টাচার্য- বারীণ দত্তের নেতৃত্বে সিলেটের নানকার আন্দোলন ছিল এই সময়কার দেশ ও দুনিয়া কাঁপানো ঘটনা। পাকিস্তান আমলে ১৯৫০ সনে প্রথম জেলহত্যা রাজশাহীর খাপড়া ওয়ার্ডে শহীদ হন হানিফ, বিজন, দেলোয়ার, কম্পরাম সিংহ, সুখেন, সুধীর ও আনোয়ার। ঢাকা জেলে অনশন সংগ্রামে শহীদ হন শিবেন রায়। এঁরা সকলেই ছিলেন কমিউনিস্ট ও বামপন্থী।

কমিউনিস্ট পার্টি, গণতান্ত্রিক যুবলীগসহ বামপ্রগতিপন্থীরা মুসলিম লীগের বাঙালি মধ্যবিত্তের একাংশ ৪৮ সনে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলনকে ব্যাপকতর জনগণের মধ্যে প্রসারিত করে তুলতে সক্ষম হন। ৫২'র একুশের রক্তদান আন্দোলনকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। ভাষা আন্দোলনের গণজাগরণকে পূঁজি করে গড়ে উঠে হক- ভাসানী সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট। রচিত হয় ঐতিহাসিক ২১ দফা কর্মসূচি। কমিউনিস্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক যুবলীগ যুক্তফ্রন্টের সৃষ্টি, পুষ্টি ও বিজয়ের মূলশক্তি হয়ে উঠে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্র-তরুণদের অভিজ্ঞতা ও চেতনার উপর ভিত্তি করে ৫২-র এপ্রিল মাসে গড়ে উঠে ছাত্র ইউনিয়ন।

পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রন্টের ভূমিধস বিজয়ের পর গণরায় বাতিলে সক্ষম হয় পাক শাসকচক্র। চাপানো হয় কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি শাসন, ভেঙ্গে দেয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা। ষড়যন্ত্রের একপর্যায়ে আওয়ামী লীগের একাংশকে প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে মন্ত্রীত্বের বিনিময়ে স্বায়ত্বশাসনের দাবি থেকে সরিয়ে আনতে সক্ষম হয় এবং আমেরিকার সাথে সেন্টো, সিয়াটো সামরিক চুক্তিতে সমর্থন দিতে প্রভাবিত করে। পরিণতিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম থেকে আওয়ামী লীগকে সরিয়ে আনার শাসকচক্রের এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীন বৈদেশিক নীতির পক্ষে মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ যারা আওয়ামী লীগে কর্মরত ছিলেন তাঁরা ন্যাপে যোগ দিলেন। পরবর্তীতে দেশের রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনায় প্রধান ভূমিকা পালন করে জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগের ধারা এবং ন্যাপ- কমিউনিস্ট পার্টির বাম-প্রগতিশীল ধারা। এই সময়ে বাঙালি জাতির নব উন্মেষিত জাতীয় সংগ্রামকে রুদ্ধ করতে ৫৮ সনে শুরু হয় আইয়ুবী সামরিক শাসন ও শোষণ-পীড়নের বর্বর অধ্যায়। বৃটিশ ও পুরো পাকিস্তানি আমলে ৩০-৪০ বছর ব্যাপী শত শত কমিউনিস্ট, ন্যাপ ও বামপন্থী নেতারা কারাগার ও পলাতক জীবনে নিক্ষিপ্ত হন।

স্বৈরাচার উচ্ছেদের রক্তাক্ত গণসংগ্রাম :

প্রবল নির্যাতন প্রতিরোধ করে ক্রমশ গড়ে তোলা হয় আইয়ুবী সামরিক শাসন বিরোধী সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ এবং নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি এবং ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগ। গণতান্ত্রিক অধিকার, বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, শিক্ষার দাবি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা এবং জনগণের অন্নবস্ত্রের দাবিতে এই ছাত্র জনতার গণসংগ্রাম অপ্রতিহত হয়ে উঠে ৬২, ৬৪, ৬৬ সনের রক্তরঞ্জিত সংগ্রাম এবং ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান- যাকে বাংলাদেশের 'স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ মহড়া' নামে আখ্যা দেয়া যায়।

মুজিব-মণি সিংহ সমঝোতা :

একথাও ঐতিহাসিক সত্য যে, ১৯৬১ সনের শেষ দিকে শেখ মুজিবর রহমানের সাথে কমরেড মণি সিংহ ও খোকা রায়ের ৪/৫ টি গোপন বৈঠক হয়। আয়োজনকারী ছিলেন ইত্তেফাকের সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী। মণি সিংহের 'জীবন সংগ্রাম' এবং খোকা রায়ের 'সংগ্রামের তিন দশক' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, শেখ সাহেব ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সাথে স্বাধীন বাংলার শ্লোগান তুলতে চেয়েছিলেন। মণি সিংহ অবস্থা পরিপক্ক হয়নি বিবেচনায় ভিন্নমত জানান। জবাবে শেখ সাহেব জানান 'আপনার থিওরি' মানতে পারলাম না তবে পরামর্শ মানলাম।' স্বাধীনতা প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু ও মণি সিংহের মনোভাব জানা যায় এ মন্তব্য থেকে। উক্ত বৈঠকগুলোতে আওয়ামী লীগ- ন্যাপ এবং ছাত্র ইউনিয়ন-ছাত্রলীগ ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মুক্তিযুদ্ধ হয়ে উঠে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম :

বৃটিশ শাসনের অবসানের প্রায় দুই শতকের লড়াই ও পাকিস্তানের দুই যুগের এই মুক্তির লড়াই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা কখনও অগ্রণী, কখনও সম্পূরক এবং অনন্য ভূমিকা রেখে এসেছেন ধারাবাহিকভাবে। মুক্তিযুদ্ধের মর্মবাণী নির্ধারণেও তারা তাৎপর্যময় ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' রাষ্ট্রের পরিবর্তে 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের' এক অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ।

ন্যাপ ও কমিউনিষ্ট পার্টির ধৈর্যশীল প্রচেষ্টার কারণে বিশ্বশান্তি আন্দোলন, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, আফ্রোএশীয় সংহতি পরিষদ, ছাত্র-যুব-নারী- শিক্ষকদের আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয়। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, মধ্যপ্রাচ্য, চীনের বিরোধীতার মুখে উপরোক্ত সমর্থনের ফলে বিজয় অনিবার্য হয়ে উঠে।

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই কেবল গঠিত হয়নি, সম্ভব হয় স্বাধীনতার পর গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র এই চার মূলনীতি অর্জন করা।

মুক্তিযুদ্ধের প্রগতিশীল চরিত্র ও ধারা নির্মাণে কমিউনিস্ট পার্টি 'বেআইনী' থাকায় সিংহভাগ ভূমিকা পালন করে ন্যাপ। একই সাথে ছাত্র ইউনিয়ন পালন করে অসাধারণ ভূমিকা। তাছাড়া কৃষক সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, মহিলা পরিষদ সচেতন ও সংগঠিত ভূমিকা পালন করেন। সংস্কৃতি সংসদ, উদীচী ও ছায়ানট প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সংগঠন সৃষ্টি করেছিল জাতীয় মুক্তির এক সাংস্কৃতিক গণজাগরণ।

বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের প্রস্তুতিতে বামপ্রগতিশীলদের প্রধান ভূমিকা দুর্বল হয়ে পড়ে যখন বঙ্গবন্ধু ৬ দফা নিয়ে মাঠে নেমে সমগ্র জাতির মনোজগতে স্থায়ী আসন অর্জন করেন। শাসকের নিত্য নির্যাতন- চক্রান্ত জাল ছিন্ন করে প্রচন্ড সাহস ও আপোষহীনতা নিয়ে তিনি গণআন্দোলনকে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করেন। এসময়ে বামপন্থীদের শক্তির ক্ষয় ঘটে ন্যাপ, সিপিবি, ছাত্র ইউনিয়ন, কৃষক সমিতিতে ঘটে- যাওয়া চীন-রুশ দ্বন্দ্ব ও বিভাজনের কারণে। চীনপন্থীদের একাংশ মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন, অপর এক অংশ মুক্তিযুদ্ধ 'দুই কুকুরের ঝগড়া' আখ্যা দিয়ে কার্যত ভারত-বিরোধীতা এবং পাকিস্তান প্রেমের নিদর্শন রাখেন। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মস্কোপন্থী হিসাবে পরিচিত ন্যাপ- কমিউনিস্ট পার্টি- ছাত্র ইউনিয়ন ৬ দফার স্বাধিকারের সংগ্রামকে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য ৬ দফাকে হুবহু দফাওয়ারী বজায় রেখে শিক্ষা, শ্রমিক-কৃষকের অধিকার, জাতীয়করণ, প্রগতিশীল অর্থনীতি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পররাষ্ট্র নীতি সহযোগে জাতীয় কর্মসূচি ১১ দফার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ধারা সূচিত হয়, ১৯৭২ সনের সংবিধানের নির্যাস রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অন্যতম স্থপতির ভূমিকা পালনে সমর্থ হন বামপন্থীরা।

৭০ সনের নির্বাচনে প্রায় সকল আসন দখল করে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ- ১টি, মানবেন্দ্র লারমা- ১টি, প্রদেশিক আসনে এবং জাতীয় আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে একচ্ছত্র দল হিসাবে আওয়ামী লীগ ও নেতা বঙ্গবন্ধু জাতির পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের পথে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সমগ্র জাতি জেগে উঠে। ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সর্বশক্তি এই আন্দোলনে নিয়োগ করে। প্রসঙ্গত ভাসানী ন্যাপ ও চীনপন্থীদের অনেকেই ৭০ এর নির্বাচন বয়কট করে 'ভোটের মুখে লাথি মার' শ্লোগান আনে, ফলে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে একক ম্যান্ডেট পাওয়া সহজতর হয়। নির্বাচনে অংশ নিয়ে ন্যাপ (মো) একটি আসন এবং ১৭ লক্ষ ভোট পায়।

স্বাধীনতার জন্য- স্বতন্ত্রভাবে ন্যাপ-কমিউনিষ্টদের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি, গেরিলা যুদ্ধের কৌশল রপ্ত করা, বোমা বানানো, ছাত্রছাত্রীদের ট্রেনিং প্রদানের কাজে তরুণ কর্মীদের অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষণ ও মানসিক প্রস্তুতির কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করা হয়।

বিশেষত: মার্চের কালো রাতে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয় যে, এই হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে প্রয়োজন উন্নত, দক্ষ, পেশাদার সৈনিক ও গেরিলা তৈরী করা। ন্যাপ- সিপিবি ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে যুদ্ধকালীন সংগঠন গড়ে তোলার কাজে গুরুত্ব সহকারে নেমে পড়ে।

নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধ :

২৬ মার্চ শুরু হওয়া সশস্ত্র সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধ বলে আখ্যায়িত হয়। ৯ মাসের এই সশস্ত্র যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সনে। ৯৩ হাজার পাক হানাদার বাহিনীর সদস্য মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে। স্বাধীনভাবে ন্যাপ- কমিউনিষ্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। ন্যাপ-কমিউনিস্টরা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সর্বশক্তি নিয়ে 'জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট' ও 'সর্বদলীয় জাতীয় সরকার' গঠনের প্রস্তাব দেয় যা গ্রহণ করা হয় না। অবশ্য সেপ্টেম্বর মাসে নানান বিবেচনায় মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টামন্ডলীতে মৌলানা ভাসানী অধ্যাপক মোজাফফ্র আহমেদ, মণি সিংহ, কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধরকেও যুক্ত করা হয়। যৌথ গেরিলা বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার, সেক্টর কমান্ডারগণ এবং ভারতীয় সেনাকর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ নিয়মিতভাবে রাখা হয়। অন্যান্য কমিউনিস্ট ও বামপন্থী অংশের সাথে আলাপ আলোচনাও অব্যাহত থাকে।

পৃষ্ঠা ৬

বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং আমাদের অঙ্গীকার

শহিদুল ইসলাম

একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে হটিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল এর পেছনে যেসব অঙ্গীকার ছিল সেসবই ছিল প্রগতিবাদী চেতনাস্নাত। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির অঙ্গীকার আমাদের বাহাত্তরের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, পঁচাত্তর পরবর্তী শাসকরা একটানা কয়েক বছর তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থকরণের জন্য নানাবিধ অপকাণ্ড করেন এবং সংবিধানে ছুরি চালিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের ওপর চরম আঘাত করেন। এ দেশে নেমে আসে গাঢ় ছায়া। এই ছায়ায় অনেকের অধিকার ঢাকা পড়ে যায়। বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই বিরূপতার চরম শিকার হয়। টেনে দেয়া হয় বিভেদ রেখা। সংখ্যালঘুদের অধিকারের ওপর পড়ে স্বার্থান্বেষীদের ছোবল। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে অপছায়া দূরীকরণে পদক্ষেপ নিতে থাকে। স্বাধীন দেশে সংখ্যালঘুরা নানাভাবে আক্রান্ত হতে থাকে মহল বিশেষের দ্বারা। আওয়ামী লীগ কিংবা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার বরাবরই সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করার পাশাপাশি বহুবিধ কাজ করে আসছে। তারপরও হীন চক্রান্তকারীদের কুদৃষ্টিমুক্ত সংখ্যালঘুরা হতে পারেনি। তারা তাদের অধিকার রক্ষায় একটা প্যাটফরম গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয় যা তাদের আত্মরক্ষার জন্যও প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে কোনো বিভেদ রেখা টেনে দেয়ার অবকাশ ছিল না। কারণ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বিশ্ব ইতিহাসে অন্যরকমভাবে স্বীকৃত এবং জ্বল জ্বলও করছে বটে। আমরা এখনো দৃঢ়ভাবে বলি এবং ভবিষ্যতেও বলব যে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এই বাংলাদেশে সবার অধিকার সমান। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আমাদের এই উচ্চারণের বিপক্ষে সব সময়ই ছিল এবং এখনো আছে।

তবে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার সবার অধিকার সংরক্ষণে যথাযথ ভূমিকা পালন করে আসছে বলেই মনে করি। কোনো কোনো সম্প্রদায় যদি তাদের অধিকার রক্ষায় কিংবা হীনস্বার্থবাদীদের চক্রান্ত থেকে নিজেদের বাঁচাতে ঐক্যবদ্ধ হয় কিংবা থাকে তাতে দোষের কিছুই নেই।

রক্তস্নাত বাংলাদেশে আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিষয়ে বা কোনো হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে শুধু ঐক্যবদ্ধই থাকব না একই করণীয় সব কিছু করবও। প্রগতিবাদীরা তাতে কোনো রকম দ্বিমত পোষণ করবেন না এটি আমার স্থির বিশ্বাস।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞান দর্শনের গবেষক

আমরা এখনো দৃঢ়ভাবে বলি এবং ভবিষ্যতেও বলব যে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এই বাংলাদেশে সবার অধিকার সমান। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আমাদের এই উচ্চারণের বিপক্ষে সব সময়ই ছিল এবং এখনো আছে। তবে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার সবার অধিকার সংরক্ষণে যথাযথ ভূমিকা পালন করে আসছে বলেই মনে করি। কোনো কোনো সম্প্রদায় যদি তাদের অধিকার রক্ষায় কিংবা হীনস্বার্থবাদীদের চক্রান্ত থেকে নিজেদের বাঁচাতে ঐক্যবদ্ধ হয় কিংবা থাকে তাতে দোষের কিছুই নেই।

রক্তস্নাত বাংলাদেশে প্রগতিবাদীদের ঐক্যই জরুরি

ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

একাত্তর আমাদের মহান অধ্যায়। একাত্তরের অর্জন আমাদের মহান অর্জন। এই অর্জনের জন্য বাঙালি জাতির অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা বিশ্ব ইতিহাসে স্বীকৃত। একাত্তরে নেতিবাচক অনেক কিছুর কবর রচিত হলেও স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র কয়েক বছরের মাথায় সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে অন্ধকারের শক্তি বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানি ধারায় নিয়ে যেতে বহু রকম হীন কাজ করেছে। এসবই চরম নিন্দনীয়-ঘৃণ্য। বাংলাদেশের মানুষ অসাম্প্রদায়িক এই সত্যের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। কিন্তু মানুষ নামধারী কতিপয় স্বার্থান্বেষী প্রাণী এই সত্যকে কালিমালিপ্ত করতে বারবার অপচেষ্টা করেছে এবং এখনো করছে। তবে আওয়ামী লীগ অতীতে যেমন বর্তমানেও তেমনি তাদের নেতৃত্বাধীন সরকার রক্তস্নাত বাংলাদেশকে যারা কলঙ্কিত করতে তৎপর তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে। আমাদের জন্য আশার কথা এটিই। নিকট অতীতে এ দেশে পুরোহিত-যাজক-ভিক্ষুসহ মুক্তচিন্তক প্রগতিবাদী অনেককে লক্ষ্যে পরিণত করে জীবননাশ করেছে প্রতিক্রিয়াশীল কীটরা। সংখ্যালঘুসহ প্রগতিবাদী অনেকেই এ জন্য ভুগছেন নিরাপত্তাহীনতায়। সরকারের এত কঠোর অবস্থানের পরও মন্দিরে হামলার ঘটনা ঘটেছে, অপশক্তি প্রতিমা ভাঙছে। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের জন্য এই কলঙ্ক দাগ যারা মোটা করে চলেছে তারা দেশ-জাতির শত্রু। এই চরম শত্রুদের বিরুদ্ধে এ দেশে প্রগতিবাদী সবার ঐক্য খুব জরুরি। আসুন আমরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াই। একাত্তর দূর অতীত নয়। একাত্তরে হানাদার বাহিনীসহ স্বজাতদ্রোহীদের আমরা হটিয়ে দিয়েছি এবং আমরা আমাদের অঙ্গীকারে জয়ী হয়েছি মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনা মোতাবেক যুদ্ধ চালিয়ে, যুদ্ধে জয়ী হয়ে। আজ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে মানুষ নামধারী কতিপয় কীটসমদের আমরা পরাস্ত করতে পারব না তা তো হতে পারে না। সরকার এসব ব্যাপারে যে কঠোর অবস্থানে রয়েছে এর সঙ্গে জনগণের সম্মিলিত শক্তি যোগ হলে ওদের মূলোৎপাটন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

ওরা অচিহ্নিত নয়। ওরা দানবের রূপ ধারণ করে মানুষের ওপর হামলে পড়ছে। সংখ্যালঘুরা এ দেশের নাগরিক এবং একাত্তরের মহান অধ্যায়ের তারাও গর্বিত অংশীদার। তাদের নিরাপত্তায় সরকার-প্রশাসনের পাশাপাশি আমাদেরও দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে। এর জন্য কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সংগঠন যদি অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষায় সক্রিয় থাকে তাতে সমর্থন দেয়া দরকার প্রগতিশীল সব মহলের। সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু নয় আমরা সবাই এ দেশের নাগরিক। আমাদের সবার অধিকার সমান। এই হলো আমাদের অঙ্গীকার।

লেখক : ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ

বাংলাদেশের মানুষ অসাম্প্রদায়িক এই সত্যের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। কিন্তু মানুষ নামধারী কতিপয় স্বার্থান্বেষী প্রাণী এই সত্যকে কালিমালিপ্ত করতে বারবার অপচেষ্টা করেছে এবং এখনো করছে। তবে আওয়ামী লীগ অতীতে যেমন বর্তমানেও তেমনি তাদের নেতৃত্বাধীন সরকার রক্তস্নাত বাংলাদেশকে যারা কলঙ্কিত করতে তৎপর তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে। আমাদের জন্য আশার কথা এটিই। নিকট অতীতে এ দেশে পুরোহিত-যাজক-ভিক্ষুসহ মুক্তচিন্তক প্রগতিবাদী অনেককে লক্ষ্যে পরিণত করে জীবননাশ করেছে প্রতিক্রিয়াশীল কীটরা।

কাটুক আঁধার

দেবব্রত চক্রবর্তী বিষ্ণু

আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ কিংবা ওই মহান অধ্যায়ের কোনো কিছুই প্রত্যক্ষ করতে পারিনি তাদের কাছে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ অধ্যায় অজ্ঞাত নয়। যে চেতনা ও মূল্যবোধ ধারণ করে ওই মহান পর্বের উত্থান ঘটেছিল এবং অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল অনন্য সাধারণ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যগুলোর, সেগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেনি স্বাধীন বাংলাদেশের সাড়ে চার দশক সময়কালেও। স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে নেমে আসে ঘোরতর অন্ধকার। এই অন্ধকার কাটতে সময় লাগলেও যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে তা তো কোনোদিনই উপশম হওয়ার নয়। আমরা যারা অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মূল্যবোধ ধারণ করি, বিশ্বাস করি দুঃখজনকভাবে এর মূলে কুঠারাঘাত চলতে থাকল নানা পন্থায়। কয়েক দশক পর এই বিষাদময়তার অবসান ঘটতে শুরু করলেও অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি এখনো। এই ব্যর্থতা কার তা নির্দিষ্ট করে বলাটা খুব আবশ্যক (কারণ সচেতন মানুষমাত্রই তা জানেন) না হলেও এটুকু বলা যায় অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি-আন্তরিকতা ইত্যাদির মতো জরুরি বিষয়গুলো এখনো সবক্ষেত্রে পুষ্টতা পায়নি। সংখ্যালঘুরা রক্তস্নাত বাংলাদেশের যাত্রাকাল থেকেই অন্য রকম স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেও তাদের স্বপ্ন-প্রত্যাশা বারবার হোঁচট খেয়েছে, খাচ্ছে। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন আন্দোলন-সংগ্রাম। এই আন্দোলন-সংগ্রাম গণতান্ত্রিক-সাংস্কৃতিক বটেই। আর এজন্য প্রয়োজন একটা প্যাটফরম। এই প্যাটফরম বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠলেও এ নিয়ে নানা রকম কটাক্ষ-তীর্যক বাক্যবানে বারবার আক্রান্ত হতে হচ্ছে আন্দোলনকামী-শুভপ্রত্যাশাধারী-মুক্তিকামীদের। আওয়ামী লীগ কিংবা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার সংখ্যালঘুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে আন্তরিক নয় এ কথা বলার অবকাশ না থাকলেও এক্ষেত্রেও যে কিছু বিঘ্ন ঘটছে কতিপয় স্ববিরোধীতার কারণে তাও অসত্য নয়। আমরা যদি এর নিরিখগুলো পর্যায়ক্রমে বিশেষণ করি তাহলে স্পষ্টভাবে কখনো কখনো এমন কিছু দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠে যে, কারো কারোর মনোবৈকল্য সামগ্রিকতার প্রেক্ষাপটে অপছায়া ফেলছে। এই অপছায়া দূরীকরণে দায়-দায়িত্ব যাদের তারা কতটা চেতনাঋদ্ধ-অঙ্গীকারাবদ্ধ তা প্রমাণ করার দায়ও তাদেরই।

আমরা কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশের স্বপ্নে ধারণ করে নিরন্তর যে লড়াই এখনো চালিয়ে যাচ্ছি এর শেষ কবে তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। মুশকিল এ কারণে যে, বাংলাদেশের অধ্যায় সৃষ্টি লগ্নে যেসব নেতিবাচকতার কবর রচনা করে অভ্যুদয় ঘটেছিল স্বাধীন-সার্বভৌম রক্তস্নাত দেশের, সেই দেশে কবর থেকে উঠে সেই সব নেতিবাচকতা ইতোমধ্যে বহুবিধ ক্ষত সৃষ্টি করেছে। এসবই অনাকাঙ্ক্ষিত-অনভিপ্রেত। তবুও লড়াই চলছে

পৃষ্ঠা ২

সংখ্যালঘুরা রক্তস্নাত বাংলাদেশের যাত্রাকাল থেকেই অন্য রকম স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেও তাদের স্বপ্ন-প্রত্যাশা বারবার হোঁচট খেয়েছে, খাচ্ছে। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন আন্দোলন-সংগ্রাম। এই আন্দোলন-সংগ্রাম গণতান্ত্রিক-সাংস্কৃতিক বটেই। আর এজন্য প্রয়োজন একটা প্যাটফরম। এই প্যাটফরম বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠলেও এ নিয়ে নানা রকম কটাক্ষ-তীর্যক বাক্যবানে বারবার আক্রান্ত হতে হচ্ছে আন্দোলনকামী-শুভপ্রত্যাশাধারী-মুক্তিকামীদের। আওয়ামী লীগ কিংবা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার সংখ্যালঘুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে আন্তরিক নয় এ কথা বলার অবকাশ না থাকলেও এক্ষেত্রেও যে কিছু বিঘ্ন ঘটছে কতিপয় স্ববিরোধীতার কারণে তাও অসত্য নয়। আমরা যদি এর নিরিখগুলো পর্যায়ক্রমে বিশেষণ করি তাহলে স্পষ্টভাবে কখনো কখনো এমন কিছু দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠে যে, কারো কারোর মনোবৈকল্য সামগ্রিকতার প্রেক্ষাপটে অপছায়া ফেলছে। এই অপছায়া দূরীকরণে দায়-দায়িত্ব যাদের তারা কতটা চেতনাঋদ্ধ-অঙ্গীকারাবদ্ধ তা প্রমাণ করার দায়ও তাদেরই।

মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ গেরিলা বাহিনীর ভূমিকা

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

একথাও সত্য যে, প্রবাসী মুজিবনগর সরকারকে আভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলা করে প্রায়ই অগ্রসর হতে হয়েছে। তার মধ্যে ছিল মুজিব বাহিনীর বিরোধীতা, মোশতাক আহমদের কনফেডারেশন ফর্মূলা নিয়ে চক্রান্ত, সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ইত্যাদি। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ এই সব বাধা জটিলতা দক্ষতা ও ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেন। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরোধ দূর করা এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অপরাপর দলের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা পালনে ন্যাপ- কমিউনিস্ট পার্টি সজাগ- সতর্ক থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন। অক্টোবর মাসে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগের এক যুক্ত আহ্বান প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি এফ, এফ, বিএলএফ, বিশেষ গেরিলা বাহিনী সহ গেরিলা যোদ্ধাদের মধ্যে সমঝোতা ও সমন্বয় গড়ে তোলার একটা কাঠামোও তৈরী হয়। এই সব কাজে ন্যাপ- কমিউনিষ্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়ন উদ্যোগী ভূমিকা নিয়মিত পালন করে এসেছে। একই সঙ্গে তারা মোশতাকের মার্কিন মধ্যস্ততায় পাকিস্তানের সাথে ষড়যন্ত্রের নামে বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচার-প্রচারণা তীব্র ও জোরদার করে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা- সমর্থন সংগ্রহ :

বাংলাদেশে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ধারায় গড়ে উঠা মুক্তিসংগ্রাম যে বায়াফ্রা'র মতো 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আন্দোলন নয় তা স্পষ্ট করে এবং মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বিশেষভাবে কমিউনিষ্ট পার্টি ৩ মে দুনিয়ার দেশে দেশে ভ্রাতৃপ্রতীম পার্টিদের সমর্থন-সহযোগিতা আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ন্যাপ ও সিপিবি জাতিসংঘ, বিশ্বশান্তি পরিষদ, আফ্রোএশীয় গণসংহতি পরিষদ, ছাত্র- যুব নারীসহ বিশ্বব্যাপী প্রগতিশীল সংগঠন সমূহকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সংহতি প্রকাশ ও সমর্থন প্রদানের জন্য বিশেষ বার্তা ও প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এইসব প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে আগস্ট মাসের বুদাপেষ্ট আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদের নেতৃত্বে ন্যাপের কেন্দ্রীয় নেতা দেওয়ান মাহাবুব আলী ও কমিউনিষ্ট পার্টির ডাঃ সারোয়ার আলী। জাতিসংঘে সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে অধ্যাপক মোজাফফ্র আহমেদ সহ ১৬ জনের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ, বিশ্ব গণতান্ত্রিক ছাত্র সম্মেলনে নুরুল ইসলাম নাহিদের অংশগ্রহণ উলেখযোগ্য। বুদাপেষ্ট সম্মেলনে সফলভাবে বাংলাদেশের প্রতি বিশ্ব সংহতি অর্জন করে প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ন্যাপ নেতা দেওয়ান মাহাবুব আলী দিলি- বিমান বন্দরে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে কবর দেয়া হয় পুরান দিলির জামে মসজিদ এলাকায়।

ভারতের মাটিতে আশ্রিত শরণার্থী শিবিরে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন যাপনকারী স্বদেশের উদ্বাস্তু ভাই বোনের মনোবল চাঙ্গা রাখতে এবং তাদের দুঃসহ অবস্থা সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে জনসভা, বৈঠক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রিলিফ ও মেডিকেল টিম, স্কুল চালু করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাশাপাশি ভারতীয় জনগণের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে সহায়ক ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ এবং বিশেষভাবে ভারতীয় মুসলিম সমাজে বিরাজমান বিভ্রান্তি-বিরূপতা-অজ্ঞতা দূর করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নিয়ে আসার কঠিন কাজটা করেছিলেন ন্যাপ-কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠিত প্রচার কার্যক্রম। 'মুক্তির গান-এর নিয়মিত উদ্দীপনার অনুষ্ঠান' উদ্বাস্তু এলাকায় রাজনৈতিক প্রচার ও সভা, বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান মালায় বামপ্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রচারক ও সংস্কৃতিকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তৎকালীন ন্যাপ নেত্রী অগ্নিকন্যা খ্যাত মতিয়া চৌধুরীসহ নেতৃবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সিপিআইয়ের সাহায্য- সহযোগিতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে জনমত গড়ে তোলেন।

এই সব প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বব্যাপী সংহতি আন্দোলন জোরদার হয়। এই উদ্যোগের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের ব্যাপক সমর্থন আদায় সহজতর হয়। এই পটভূমিকায় ৯ আগস্ট '৭১ তারিখে স্বাক্ষরিত হয় ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেকার ২৫ বছরের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি। এ চুক্তির মাধ্যমে পরাশক্তির সক্রিয় ও কার্যকর সমর্থন ভারতকে বাংলাদেশ প্রশ্নে আত্মবিশ্বাসী, শক্তিশালী ও সাহসী ভূমিকা পালনে উৎসাহ যোগায়। এতে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়- মুক্তিযুদ্ধের বিজয় প্রশ্নে এর পর থেকে আস্থা বেড়ে যায়। এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশের ভেতরে এফ এফ বাহিনী ও গেরিলা বাহিনীর ইনডাকশন ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ বেড়ে যায়। এই ক্ষেত্রে ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের অভ্যন্তরে কার্যক্রম :

ন্যাপ- কমিউনিস্ট পার্টি ২৬ মার্চ, ১৯৭১ এর পর সংগঠিত ভাবে দেশের ভেতর নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করে, তথ্য সংগ্রহ, টেকনিক্যাল টিম, আশ্রয় কেন্দ্র, ট্রেনিং এর জন্য যুবকদের নিয়মিত ভারতে প্রেরণের ব্যবস্থা প্রভৃতি করা হয়। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গেরিলাদের দেশে অপারেশন চালানোর সুব্যবস্থা করা হয়। মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করে কী কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে ন্যাপের পত্রিকা হাসান আলী সম্পাদিত 'নতুন বাংলা' এবং কমিউনিস্ট পার্টি সম্পাদিত 'মুক্তিযুদ্ধ' সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং প্রচারপত্রসমূহ পথ দেখাতো।

ভারতে শরণার্থী শিবিরে ও জনগণের মধ্যে কাজ :

ভারতের মাটিতে আশ্রিত শরণার্থী শিবিরে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন যাপনকারী স্বদেশের উদ্বাস্তু ভাই বোনের মনোবল চাঙ্গা রাখতে এবং তাদের দুঃসহ অবস্থা সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে জনসভা, বৈঠক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রিলিফ ও মেডিকেল টিম, স্কুল চালু করা প্রভৃতির পাশাপাশি ভারতীয় জনগণের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে সহায়ক ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ এবং বিশেষভাবে ভারতীয় মুসলিম সমাজে বিরাজমান বিভ্রান্তি-বিরূপতা-অজ্ঞতা দূর করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নিয়ে আসার কঠিন কাজটা করেছিলেন ন্যাপ-কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠিত প্রচার কার্যক্রম। 'মুক্তির গান-এর নিয়মিত উদ্দীপনার অনুষ্ঠান' উদ্বাস্তু এলাকায় রাজনৈতিক প্রচার ও সভা, বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানমালায় বামপ্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রচারক ও সংস্কৃতিকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তৎকালীন ন্যাপ নেত্রী অগ্নিকন্যা খ্যাত মতিয়া চৌধুরীসহ নেতৃবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সিপিআইয়ের সাহায্য- সহযোগিতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে জনমত গড়ে তোলেন। সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত "বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক সমিতি" সর্বতোভাবে সাহায্য- সমর্থন জুগিয়েছে ৯ মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের কঠিন দিনগুলিতে।

যুদ্ধে বামপন্থীরা :

দেশের ভেতর ২৬ মার্চ থেকে ন্যাপ- সিপিবি- ছাত্র ইউনিয়নের নেতা- কর্মীরা যেখানে যতটুকু সম্ভব সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজে পুলিশ- বিডিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যদের সহায়তায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, রায়পুরা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, বরিশাল, বাগেরহাট, বরগুনা, পিরোজপুর, যশোর- খুলনায় প্রাথমিক প্রতিরোধের মাধ্যমে পরবর্তীতে প্রতিরোধের শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠে উক্ত অঞ্চলসমূহ। প্রথম দিকে স্বল্প ট্রেনিং প্রাপ্ত যুবকেরা উপরোক্ত অঞ্চলে সফলতার সাথে গেরিলা অপারেশন সম্পাদন করে- যাদের মধ্যে বামপন্থীরা ছিলেন উলেখযোগ্য সংখ্যক। সেক্টর কমান্ডারদের অধীনে এফএফ প্রশিক্ষণে বামপন্থীদের অংশগ্রহণে অন্যান্য বাধা সত্ত্বেও গোপনীয়তা বজায় রেখে উলেখযোগ্য সংখ্যক বাম প্রগতিশীল যুবক প্রশিক্ষণ শেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন- যার একজন হলেন চাঁদপুরের জীবন কানাই চক্রবর্তী যিনি পরবর্তীতে মেজর জেনারেল হিসাবে রিটায়ার করেন। ঢাকার ক্রাক পাটুন, মেরিনবাহিনী, কাদের সিদ্দিকীর বাহিনী এবং সদ্য গড়ে- ওঠা সেনা- বিমান বাহিনীতে বামপন্থীরা কৃতিত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেন। পাক হানাদার বাহিনী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অভিযান পর্বের প্রাথমিক প্রতিরোধ শেষে বাম নেতা কর্মীরা উন্নত প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র- গোলাবারুদের জন্য আগরতলা, কোলকাতা, মেঘালয়সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিকল্পিত ও বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থিত হন। ন্যাপ- সিপিবি- ছাত্র ইউনিয়নের নেতা কর্মীরা ভারতে আগত তাদের কর্মীদের যৌথভাবে দেখাশুনার ব্যবস্থা করেন। উক্ত এলাকাসমূহে ইয়ুথ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চলতে থাকে- এদের একাংশ এফএফ- এ যোগ দেন।

বিশেষ গেরিলা বাহিনী গঠন :

মে, ১৯৭১ মাসে ন্যাপ- কমিউনিস্ট পার্টি- ছাত্র ইউনিয়ন বিশেষ গেরিলা বাহিনী গঠন করা হয়। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, প্রভৃতি রাজ্যে অনেকগুলো ইয়ূথ ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়। আগস্ট মাস পর্যন্ত উক্ত ক্যাম্পে ২০ হাজারের অধিক যুবকদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রাথমিক ধরনের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়।

ভারত সরকার এই বিশেষ গেরিলা বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নানান বিবেচনায় ভারত সরকার কর্তৃক বিশেষ গেরিলা বাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম খুবই গোপনীয়তায় সম্পন্ন হোত। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যাচ ট্রেনিং শেষে একের পর এক ছোট ছোট গ্রুপে অস্ত্র, গোলাবারুদ, গ্রেনেড-এক্সপ্লোসিভসহ পর্যায়ক্রমে দেশের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে সেপ্টেম্বর থেকে অপারেশন শুরু করে। অক্টোবর- নভেম্বরে অপারেশনের সংখ্যা বাড়তে থাকলে দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের কৌশলের বদল ঘটে। নভেম্বরে বুঝা যায় বড় ধরণের সামরিক আক্রমণ ঘটানো হবে- সেজন্য বিশেষ গেরিলা বাহিনীর এ্যাকশনের সংখ্যা দ্রুততার সাথে বাড়াতে- রায়পুরা, মনোহরদী, শিবপুর, চট্টগ্রাম, বৃহত্তর বরিশাল, রাজশাহী, সিলেট অঞ্চলে সফল গেরিলা অপারেশন জোরদার হয়।

বেতিয়ারা যুদ্ধ :

কুমিলার বেতিয়ারায় দেশপ্রেমের এক গৌরবদীপ্ত অধ্যায় রচিত হয়। ন্যাপ- কমিউনিস্ট পার্টি- ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ কমান্ডে পরিচালিত এক সশস্ত্র যোদ্ধা দলের সাথে পাক হানাদার বাহিনীর এক সম্মুখ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। কয়েক ঘন্টা ব্যাপী এই মুখোমুখি তুমুল যুদ্ধে শহীদ হন আজাদ, মুনীর, বশির, দুদু মিয়া, শহীদুলাহ, আওলাদ, কাইয়ূম, শফিক উলাহ ও কাদের- এই নয়জন বীর গেরিলা। এঁদের কারো পিঠে গুলি লাগেনি, বীরের মত যুদ্ধ করে দেশ মুক্তির বেদীমূলে শহীদ হয়েছেন তাঁরা।

বিশেষ গেরিলা বাহিনী কমান্ড :

ন্যাপ- কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্র ইউনিয়ন যৌথ বিশেষ গেরিলা বাহিনী কমান্ড পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয় দুটি জোনকে কেন্দ্র করে সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হোত। কমরেড মো: ফরহাদের নেতৃত্বে চৌধুরী হারুণর রশিদ, কমান্ডার আবদুর রউফ প্রমুখদের পরিচালিত এই গেরিলা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যখন কনভেনশন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে সমগ্র দেশ তখন সকল ইউনিটকে নির্দেশ দেয়া হোল গ্রাম ও জেলা থেকে ঢাকার চারপাশ 'ঘেরাও দাও'। সেই লক্ষ্য অর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ে গেরিলা বাহিনীর সকল ইউনিট। এবং গেরিলা বাহিনীর একাংশ ঢাকার শহীদ মিনারে মাহাবুব জামানের নেতৃত্বে প্রথম দল হিসাবে বিজয় উৎসবে শরিক হয়।

অস্ত্র সমর্পণ :

৩০ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখে ঢাকা স্টেডিয়ামে ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি- ছাত্র ইউনিয়নের বিশেষ গেরিলা বাহিনীর অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান গেরিলা বাহিনীর অস্ত্র- গোলা- বারুদ- রকেট লাঞ্চারসহ বিশাল অস্ত্র সম্ভার রাষ্ট্রের পক্ষে গ্রহণ করেন। অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিশেষ গেরিলা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ। বঙ্গবন্ধুর হাতে একে একে গেরিলা বাহিনীর পক্ষ থেকে ন্যাপের পক্ষে পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সিপিবির পক্ষে কমরেড ওসমান গণি এবং ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম অস্ত্র সমর্পন করেন। অনুষ্ঠানে ৩ দলের ঢাকা সদর উত্তর, সদর দক্ষিণ ও নারায়ণগঞ্জের গেরিলাদের ২৬৩টি রাইফেল, ১০টি এলএমজি, ১৬টি স্টেনগান, ২টি এসএলআর, ২১৩টি হ্যান্ড গ্রেনেড, ১টি এসএমজি, ২টি জিএফ রাইফেল, ১টি মর্টার, ১টি টিয়ারগ্যাস রাইফেল, ১টি এসকেএস এবং বিপুল কার্টিজ ও গোলাবারুদ জমা দেওয়া হয়। (এছাড়া জেলা ভিত্তিক গেরিলা বাহিনীর অস্ত্র সমর্পন করা হয় জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে)।

ঢাকা স্টেডিয়ামের ঐদিনের অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধা সদস্য- সদস্যারা বঙ্গবন্ধুকে সামরিক কায়দায় গার্ড অব অনার প্রদান করে। সমবেত মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বলেন 'আমাদের দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আমেরিকা হোক বা অন্য যে কোন দেশই হোক যারাই ষড়যন্ত্র করবে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের প্রতিহত করবো। বাংলাদেশে সাড়ে ৭ কোটি জনতা তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত বলে তিনি মন্তব্য করেন। তুমুল করতালির মধ্যে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন 'চির দিনের জন্য আপনাদের কাছ থেকে অস্ত্র নিচ্ছি না। প্রয়োজন হলে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের মোকাবেলা করার জন্য আমি আবার আপনাদেরকে অস্ত্র ফেরত দেব।' বঙ্গবন্ধু বলেন 'আপনারা সংগ্রাম করেছেন জালেমের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার জন্য আপনারা আত্মাহুতি দিয়েছেন, অশেষ ত্যাগ স্বীকার করেছেন, শহীদ ভাইরা জীবন দিয়ে গেছেন। আমাদের মা বোনের উপর ওরা অমানুষিক অত্যাচার করেছে। স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের মানুষ যে রক্ত দিয়েছে দুনিয়ার কোন দেশ এত কঠিন মূল্য দেয়নি। হানাদার বাহিনী আমাদের সোনার বাংলাকে শ্মশান করে গেছে। তবে তারা আমাদের সোনার বাংলার মাটিকে নিতে পারেনি। এই মাটিতেই সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য চাই সকলের সাহায্য সহযোগিতা'।

বঙ্গবন্ধু আরও বলেন 'জনগণের জন্য গণতন্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলেই তারা সত্যিকারের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবেন।' তিনি আরও বলেন 'বাংলাদেশে গণতন্ত্র হবে, সমাজতন্ত্র আসবে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা কায়েম হবে।'(দৈনিক বাংলা ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ সন)।

(চলবে)

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য ধরে রাখতে হবে

॥ পর্যবেক্ষক ॥

এখন সারাদেশে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষে জনমত বিকশিত হচ্ছে তা দীর্ঘদিন থেকেই প্রত্যাশিত ছিল। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর একাত্তরে পরাজিত শক্তি বলতে গেলে দেশ দখল করেছিল। তিরিশ লাখ প্রাণ, কয়েক লাখ নারীর সম্ভ্রম এবং বিপুল ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে যে লাল-সবুজ পতাকার বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল, তাকে বিপর্যস্ত করে দ্বিতীয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী রাজনীতির লক্ষ্য। গোড়াতেই লক্ষ্য করা যায়, বঙ্গবন্ধুর রক্তের দাগ না মুছতেই খন্দকার মোশতাক বঙ্গভবনে হত্যাকারীদের নিয়ে এক বৈঠকে পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন গঠনের ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ভারত এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয় এবং ভারতীয় হাইকমিশনার সমর সেন দিলি-থেকে ফিরেই বঙ্গভবনে গিয়ে ভারতের কঠোর মনোভাবের কথা জানিয়ে দেন। জানা যায়, সমরবাবু এই মনোভাব খন্দকারকে জানাতেই, তিনি হতবিহ্বল হয়ে যান। খন্দকার ভয় ও হতাশায় এতোটাই ভেঙে পড়েন যে, মাথার টুপি নিচে পড়ে যায়। তিনি চেয়েছিলেন তড়িঘড়ি কনফেডারেশনের ঘোষণা দিলেই পথের কাঁটা দূর হয়ে যাবে। পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সৌদি আরব ও পাকিস্তান রয়েছে, ভাবনা নেই। কিন্তু সবকিছু গুবলেট হয়ে যায়।

এই খন্দকার মোশতাক একাত্তরে কলকাতায় বসেই ষড়যন্ত্র শুরু করেছিলেন, যোগাযোগ তৈরি করেছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে। যোগাযোগ হয়েছিল মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে, চীন তো পাকিস্তানের জানি দোস্ত হিসেবে পাশে রয়েছেই। এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বাংলাদেশের বিপবী সরকার এবং ভারত সরকার জানতে পারে। তখনই খন্দকারের ক্ষমতা খর্ব করা হয়। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন, সে সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তার শেষ অভিলাষ ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠন। যার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল কলকাতায় বসে। তারপরও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে খন্দকারকে আস্থায় রেখেছিলেন, যার ভয়াবহ মূল্য দিতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে। খন্দকার ও তার ঘাতকবাহিনী বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবারের সদস্যদের (দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা) বিদেশে থাকায় বেঁচে যান এবং আত্মীয় সেরনিয়াবাত ও শেখ মুজিবকেও সপরিবারে হত্যা করে। এই সেই খন্দকার, যিনি বঙ্গবন্ধুর পিতৃ-বিয়োগে সবচাইতে বেশি কান্নাকাটি করে সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই খন্দকার মোশতাক একাত্তরে কলকাতায় বসেই ষড়যন্ত্র শুরু করেছিলেন, যোগাযোগ তৈরি করেছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে। যোগাযোগ হয়েছিল মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে, চীন তো পাকিস্তানের জানি দোস্ত হিসেবে পাশে রয়েছেই। এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বাংলাদেশের বিপবী সরকার এবং ভারত সরকার জানতে পারে। তখনই খন্দকারের ক্ষমতা খর্ব করা হয়। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন, সে সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

তার শেষ অভিলাষ ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠন। যার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল কলকাতায় বসে। তারপরও বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে খন্দকারকে আস্থায় রেখেছিলেন, যার ভয়াবহ মূল্য দিতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে। খন্দকার ও তার ঘাতকবাহিনী বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবারের সদস্যদের (দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় বেঁচে যান) এবং আত্মীয় সেরনিয়াবাত ও শেখ মনিকে সপরিবারে হত্যা করে। এই সেই খন্দকার, যিনি বঙ্গবন্ধুর পিতৃ-বিয়োগে সবচাইতে বেশি কান্নাকাটি করে সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

খন্দকার মোশতাক ও তার ঘাতকবাহিনী মূল কাজ সম্পন্ন করার পর মঞ্চে আবির্ভূত হন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান। কনফেডারেশনের স্বপ্ন ভেঙে গেলেও মনের ঘুমিয়ে থাকা আবেগ মাঝে-মধ্যেই মাথাচাড়া দিয়েছে। তবে জিয়াউর রহমানের কৌশল ছিল ভিন্ন। তিনি প্রথমেই ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে আঘাত করেন, ইসলামি মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার কথা বলতে শুরু করেন। যেন ভাবখানা এই বঙ্গবন্ধু ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতির কথা বলে ইসলামকে নির্বাসিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু বারবার একথাটা জোর দিয়ে বলেছেন, মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না।...এই বাংলাদেশ হবে সকল ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও ভ্রাতৃত্ববোধের অনন্য নজির। জিয়াউর রাজনীতির মঞ্চে আরো একটা বিষয় জোর দিয়ে বলতে শুরু করেন, তিনিই বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছেন। দুঃখজনক হচ্ছে, এমন এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ তখন তৈরি করা হয়েছিল, কেউ সাহস করে কথা বলতে এগিয়ে আসেননি। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর চার বিশ্বস্ত সহযোদ্ধাকে (কারাগারে) হত্যা করার পর ভয় ও আশংকায় আওয়ামী লীগের মধ্যে এক ধরনের শংকিত-মানসিকতা তৈরি হয়েছিল, যা থেকে তেমন কেউ বেরিয়ে আসতে পারেননি। শেখ হাসিনা ফিরে এসে এই শূন্যতা পূরণ করেন।

জিয়াউর রহমান এই শূন্যতা এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে নমনীয় মনোভাবের সুযোগ নিয়েছিলেন। তিনি একদিকে সাংবিধানিক সাম্প্রদায়িকতার সূচনা করেন, ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের ওপর বঙ্গবন্ধু আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন, একাত্তরের পরাজিতদের পুনর্বাসিত করে সরকারের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন পুনরুজ্জীবিত করে (বঙ্গবন্ধু এই কালো আইনটি বাতিল করেছিলেন) ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জায়গা-জমি দখলের সুযোগ করে দেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে হিন্দুদের দেশত্যাগে বাধ্য করা এবং অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি যাতে মাথা তুলতে না পারে সেজন্যেই এসব পদক্ষেপ নেয়া হয়। জিয়া ঘাতকদের যথেষ্ট কদর দিয়ে পুনর্বাসিত করেন। বঙ্গবন্ধু, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও বঙ্গবন্ধুর স্বজনদের হত্যাকারীদের বিচার বন্ধ করা ও পুনর্বাসিত করার পিছনে কী কারণ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। পরবর্তীকালে জেনারেল এরশাদও এই ঘাতকদের সম্মানিত করেন। শুধু তাই নয়, এরশাদের আমলে এই ঘাতকরা রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ পায় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনরত দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায়, ঘাতক দলকে নিয়ে এরশাদ সাহেব নির্বাচন করেন। ঘাতকদল নেতা বিরোধী দলীয় নেতার মর্যাদা পায়। ইতিহাসের এই বীভৎস অধ্যায়গুলো সহজে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কারণ এভাবেই ধর্মান্ধতার রাজনীতি পরিপুষ্ট হয়েছে, জঙ্গিবাদের বিকাশ ঘটেছে। ১৯৭৫ সালের পরে যারা ক্ষমতায় ছিলেন এবং দু'দমকেরও বেশি রাজত্ব করেছেন তারা কেউ জঙ্গিবাদ বিকাশের দায় থেকে হাত মুছে নিতে পারেন না।

একই সঙ্গে আরো বলা প্রয়োজন, এই দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতার মসনদে থাকা রাজনৈতিক শক্তিকে যেসব দেশ সহায়তা করেছে তারাও জঙ্গিবাদের বিকাশে তাদের মদদ দেয়ার দায় এড়াতে পারে না। আজ তারাই বেশি চেঁচাচ্ছে, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটেছে। কোন কোন দেশ আবার তাদের নাগরিকদের বাংলাদেশ ভ্রমণে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিয়েছে। কী হাস্যকর ভূমিকা। জঙ্গিবাদ সবচেয়ে জোরালোভাবে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে ২০০১ সালে নির্বাচনের পর। সে এক ভয়াবহ দুঃসময়। আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী ও ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর একাত্তরের ভয়াবহতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নির্বাচনে বিজয়ীরা। ঘরে ঘরে কান্নার রোল। বিশ্বের ইতিহাসে নির্বাচনে বিজয়ীদের হামলা-অত্যাচার-নির্যাতন-নির্বিচার ধর্ষণ চালানোর কোন নিজর নেই। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিমানে আকাশ ভ্রমণ শেষে ঢাকায় ফিরে বলেছিলেন, তিনি কোথাও অত্যাচার-নির্যাতন দেখতে পাননি। সব স্বাভাবিক। কী ভয়ংকর কৌতুক।

মনে রাখা দরকার, জঙ্গিবাদ ও ধর্মান্ধতার রাজনীতি হঠাৎ করে তৈরি হয়নি। আমাদের রাজনীতির অপধারাটি ক্ষমতায় যাওয়া কিংবা ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকার স্বার্থে কখনো ধর্ম নিয়ে রাজনীতির আন্তরিকতার বিরোধিতা করেনি। বঙ্গবন্ধু বাহাত্তরের সংবিধানে চার মূলনীতির পাশাপাশি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি অর্থাৎ রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। তিনি পাকিস্তানের পরিণতি দেখেছিলেন। দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান মাত্র ২৪ বছরে চূড়ান্ত মূল্য দিয়েছে। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যেখানে ব্যবধান রচনা করে, ধর্ম দিয়ে সেখানে শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সাতচলিশের দেশভাগ এক ভয়াবহ রক্তাক্ত অধ্যায়ের সূচনা করেছিল, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ছিল তারই কঠোর জবাব। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা দেওয়ালের লেখা পড়তে পারেনি। নইলে চুয়ান্নর গণরায় অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস হতো না। আটান্নর সামরিক শাসন জারি করেও পতন ঠেকানো যায়নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধিকার আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করায় ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু বাঙালি রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায় একই শিরোনামে প্রতিরোধের গর্জন শুনিয়েছিল, 'বাঙালি রুখিয়া দাঁড়াও'। এরপর আসে রবীন্দ্রনাথের ওপর আক্রমণ, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কবিতা নিষিদ্ধ করার দুঃসাহস দেখায় পাকিস্তানিরা। কিন্তু বাঙালি জাতি যে নিষেধাজ্ঞা মানেনি, যেমন মানেনি আরবি হরফে বাংলার লেখার ফরমান। এই ইতিহাসে ফের তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি এই কারণে যে, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের প্রতিরোধের চেতনা আমরা ভুলে গেছি। অথচ এই চেতনার ওপরই দাঁড়িয়ে অভ্যুদয় ঘটেছে বাংলাদেশের। বঙ্গবন্ধু ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় চারনীতির অন্যতম নীতি করেছিলেন, ধর্ম নিয়ে রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল।

সাংবিধানিক সাম্প্রদায়িকতার জন্য আমরা জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এইচ এম এরশাদের সমালোচনা করি, কিন্তু আজ বাস্তবতা হচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরলেও, রাষ্ট্রধর্ম এখনো বহাল আছে। বাহাত্তরের সংবিধানে পুরোপুরি ফেরা হলো না। অর্থাৎ এখানেও সেই আপসের ব্যাপার। ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপস ও তোষণের মধ্য দিয়ে জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটেছে। এই সত্যটি আমাদের রাজনীতি যতদিন না উপলব্ধি করতে পারবে ততদিন জঙ্গিবাদ নির্মূল হবে না। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও লেখক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন একটা নিষ্ঠুর সত্যি কথা বলেছেন, অনেকের হৃদয়ে হেজাবি বাস করে। হেজাবি বলতে তিনি হেফাজত, জামায়াত ও বিএনপির কথা বলেছেন। এটা নেহাত সমালোচনা নয়, একটা বাস্তব উন্মোচন। এটা কার্যত আত্মসমালোচনা।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে অসাম্প্রদায়িকতায় যাত্রা শুরু হলেও ভিত্তি একেবারে নির্মূল হয়নি। স্বাধীনতার পরের বছরই শারদীয় দুর্গোৎসবের সময় দেশজুড়ে প্রতিমা ভাঙচুরের উৎসব তারই প্রমাণ। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিতরা অবস্থা বুঝে ভোল পাল্টেছিল অথবা নীরবতা অবলম্বন করেছিল। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে, ক্ষমতার মসনদে আসীন হয়। এরপর দু'দশকেরও বেশি সময় ধর্মান্ধতাকে হাতিয়ার করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। মুক্তিযুদ্ধকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়ে তাদের দেশ থেকে বিতাড়ন করে পাকিস্তানের মতো এক দুই শতাংশে নামিয়ে আনতে ধর্মান্ধ শাসকরা কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু সে চেষ্টা পুরোপুরি সফল হয়নি। ভয়ংকর এক হাতিয়ার ছিল শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন। কবর থেকে তুলে এনে এই হাতিয়ারে আরও শান দেন জিয়াউর রহমান। জায়গা-জমি হারিয়ে লাখ লাখ সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। এই সেই সেনানায়ক, যিনি ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর শুধু সংবিধান পরিবর্তন নয়, ধর্মীয় বিভাজন রেখাটা আরও স্পষ্ট করে তোলা হয়। কে মুসলমান, কে হিন্দু, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিস্টান, কারা আদিবাসী এই পরিচয়টা মুছে গিয়েছিল একাত্তরের রক্তস্রোতে, ধ্বংসস্তুপ থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী সত্তা। পরাজিত শক্তি এটা জানতে পারেনি।

আমাদের রাজনীতিতে একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে। এরশাদ সাহেব ১৯৮৮ সালে যখন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন, তাৎক্ষণিকভাবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি হরতালের ডাক দিয়েছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, বিএনপি ক্ষমতায় আসে ১৯৯১ সালে। বরং রাষ্ট্রধর্ম সমর্থন করেছে। আওয়ামী লীগ সর্বশেষ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অনেক পরিবর্তন আনলেও, রাষ্ট্রধর্ম বহাল আছে। এই বৈপরীত্য ধর্মান্ধতার বিকাশে ভূমিকা রাখছে, রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথক অবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জঙ্গিবাদ এভাবেই বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চাই, আবার রাষ্ট্র ও ধর্মের অবস্থানকে পৃথক দেখতে রাজী নই–এটা পরস্পর বিরোধিতার রাজনীতি। সুস্পষ্ট অবস্থান নিতে হলে ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি না ধর্ম ও রাষ্ট্রকে স্ব স্ব সম্মানজনক অবস্থানে রাখার রাজনীতি কোনটি পথ! এখানে সুস্পষ্ট অবস্থান ছাড়া কোন বিকল্প নেই। আজ বর্তমান সরকারের সামনে যে চ্যালেঞ্জ এটা দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূতি অপতৎপরতার ফসল।

আজ সেই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েই আমাদের জঙ্গিবাদ-বিরোধী ঐক্যকে আরও মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হবে। অন্যথায় সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

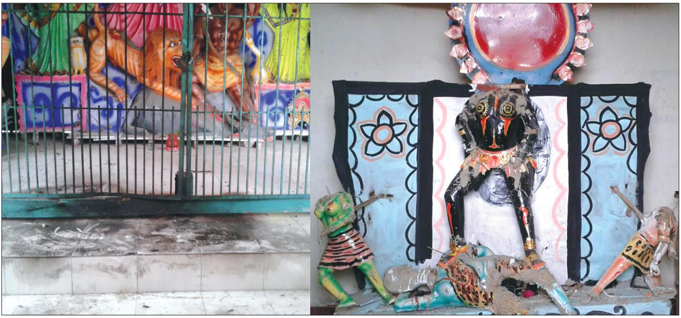

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার দেবগ্রাম সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরে ককটেল বিস্ফোরণ (বাঁয়ে)। শেরপুর জেলার শ্রীবরদী পৌর শহরের শ্মশানঘাট কালী মাতার মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর (ডানে)। ছবি : পরিষদ বার্তা

সারাদেশে প্রতিমা ভাংচুর ও মন্দিরে হামলা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

দুর্গা পূজা আসলেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিমা ভাংচুর ও মন্দিরে হামলার ঘটনা বেড়ে যায়। হিন্দুদের মাঝে আতংক সৃষ্টি এবং ফায়দা লোটার জন্য একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এসব করছে। হিন্দুদের তাড়িয়ে জমি দখলের উদ্দেশ্যেও হামলার ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। প্রশাসনের কড়া নজরদারির মাঝেও আগস্ট মাসে মন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে কয়েকটি জায়গায়। এসব হামলা-ভাঙচুর কীসের ইঙ্গিত? কেন এসব করা হচ্ছে? এমন প্রশ্ন এখন সংখ্যালঘুদের মাঝে। কিন্তু সম্প্রীতি বিনষ্টকারী এসব দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার করতে পারছে না পুলিশ। এসব ঘটনায় আতংক ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকা সংখালঘুরা আরো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া এবং নিরাপত্তার দাবি জানানো হয়েছে।

মাসের শেষ দিন ৩১ আগস্ট ভোরে শেরপুর জেলার শ্রীবরদী পৌর শহরের শ্মশানঘাট কালী মাতার মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। দুর্বৃত্ত দল তালা ভেঙে মন্দিরে ঢুকে কালী, মহাদেব, ত্রিনাথ ও শীতলা মাতা এবং রাজা হরিশ চন্দ্রের বিগ্রহসহ নয়টি প্রতিমা ভাঙচুর করে। দুর্বৃত্তরা মন্দিরের কাঁসার থালাবাটি ও অন্যান্য সামগ্রীসহ প্রায় অর্ধলাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। পুলিশ সুপার মো. মেহেদুল করিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। প্রতিমা ভাঙচুর ও লুটপাটে জড়িত অভিযোগে শহরের শ্মশানের জমি দখলদার আবুল হোসেন, নাইফুল ইসলাম ও মোস্তফাকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শ্রীবরদী থানার ওসি এস আলম।

উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদ, মন্দির কমিটি ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শহরের দহেরপাড়ে এক একর দশ শতাংশ জমির ওপর হিন্দুদের এ শ্মশানঘাটটি অবস্থিত। অভিযোগ রয়েছে, মৃত মজির উদ্দিনের ছেলে পুলিশের হাতে আটক আবুল হোসেন কয়েক বছর আগে জোর করে শ্মশানের ১৫ শতাংশ জমি দখলে নিয়ে সেখানে মাছ চাষ করছেন।

এ নিয়ে পূজা উদযাপন পরিষদ ও শ্মশান কমিটির নেতারা স্থানীয় প্রশাসনকে বেশ কয়েকবার জমি উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করলেও কোনো ফল হয়নি। উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক চন্দন দাস ও শ্মশানঘাট মন্দির কমিটির সভাপতি হারু সাহা অভিযোগ করেন, প্রভাবশালী আবুল হোসেন নৈশ প্রহরী রেখে মাছের ঘের পাহারা দিচ্ছেন। ওই নৈশপ্রহরীদের সহায়তায় মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর ও মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করেছেন আবুল হোসেন। তারা বেদখল হওয়া জমি উদ্ধার এবং প্রতিমা ভাঙচুরকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রশানের কাছে দাবি জানান।

শ্রীবরদী পৌরসভার মেয়র আবু সাইদ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার দেবগ্রাম সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ৩০ আগস্ট দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ককটেলটি কেউ মন্দিরের বাইরে থেকে ছুঁড়ে মারে। এতে কেউ হতাহত না হলেও মন্দিরের বেশ কিছুটা ক্ষতি হয়। খবর পেয়ে পরের দিন বুধবার সকালে কোটালীপাড়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করে।

মন্দিরের পাশে দেবগ্রাম উমাচরণ-পূর্ণচরণ সার্বজনীন উচ্চবিদ্যালয়ের হোষ্টেলে বসবাসকারী শিক্ষক সহদেব বিশ্বাস বলেছেন, রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে তারা মন্দিরের কাছে গেলে প্রচুর ধোঁয়া দেখতে পান। আগুনের ফুলকিও দেখেন তিনি। এতে মন্দিরের গেট ও প্রতিমা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও মন্দিরের চালের বিভিন্ন স্থান স্প্রিন্টারের আঘাতে ফুটো হয়ে গেছে।

কোটালীপাড়া থানার ওসি কামরুল ফারুক

পৃষ্ঠা ২

দিনাজপুরে ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ীর ৬৬ বছর থেকে পরিত্যক্ত ১৬৬ একর সম্পত্তি বেহাত হওয়ার পথে

॥ রতন সিং, দিনাজপুর ॥

সরকারের নজরদারির অভাবে ঐতিহ্যবাহী দিনাজপুর রাজবাড়ীর ১৭৬ একর জমি ভুয়া দলিল দস্তাবেজ মুলে বেহাত হতে চলেছে। দিনাজপুর মূল শহর হতে ৪ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত রাজবাড়ী দীর্ঘ ৬৬ বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। সরকারীভাবে এর কোন সংস্কার বা সংরক্ষণের উদ্যোগ নেই।

দীর্ঘ ৪শ বছর থেকে গড়ে ওঠা এবং ১১ নৃপতির পর্যাক্রমিক শাসনের দিনাজপুর রাজ এর অবসান ঘটে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তিতে। প্রথম রাজা শুকদেব, সময় কাল ১৬৪০-১৬৭৭ সাল। রাজ পরিবারের শেষ নৃপতি মহারাজা গিরিজা নাথ। সর্বশেষ জমিদারি বিলুপ্তি আইন জারির পর রাজ সম্পত্তি সরকারি নিয়ন্ত্রণে আসে।

জানা যায়, ১৯৫৮ সালে স্বৈরাচারী জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে রাজবাড়ীর যাবতীয় মূল্যবান অস্থাবর সম্পত্তি যেমন রাজ পরিবারের ব্যবহৃত গহনা, মন্দির বিগ্রহের অলংকার, রূপা ও তামার তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, মোটরযান এবং রূপার তৈরী অস্ত্র শস্ত্র সৌখিন সামগ্রী প্রকাশ্যে নিলাম ডাকে বিক্রির পরেই অরক্ষিত হয়ে পড়ে রাজবাড়ী। এক দিকে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব অন্য দিকে রাজবাড়ীর বিভিন্ন মহলে দেওয়াল মেঝের বিদেশী টাইলস, দামী বার্মা সেগুন-শাল কাঠের দরজা-জানালা মায় ছাদের সিলিং এর বর্গা কাঠ লুটে নেবার প্রবণতায় রাজবাড়ীর ধ্বংস প্রক্রিয়া শুরু হয়। পঞ্চাশের দশকে নতুন রানীমহলে ইপিআর পরে বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ডের অফিস ও শেষে সমাজ সেবা বিভাগের একটি শাখা অফিস খোলা হলেও এরা রাজবাড়ীর স্বার্থ সংরক্ষণ সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। অপর দিকে, ষাটের দশকের শেষার্ধে মূল রাজবাড়ীর পূর্ব প্রবেশ পথে অপরিকল্পিতভাবে সরকারি শিশু সদন নির্মাণ করা হয়। অধুনা সেখানে একটি ছোট্ট বৃদ্ধাশ্রম স্থানীয় প্রশাসন ও সমাজসেবীদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। রাজ দেবোত্তর এস্টেটের এখতিয়ারে শুধু মাত্র রয়েছে কালিয়া কান্তজীউ মন্দির আর দূর্গা মন্দির চত্বর। বাকীটা দৃশ্যত: পেশী শক্তির নিয়ন্ত্রণে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ৪শ বছরের রাজবাড়ী,

পৃষ্ঠা ২

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ২৬, বীরউত্তম সি আর দত্ত সড়ক, নাহার প্লাজা, ১০ম তলা, (কক্ষ নং, ১০০৮ বি) ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত। ০১৭১৫১৫৮৩৩২